জন্মভিত্তিক
জাতি ও বর্ণ
এবং
রামের শক্তিপথ
তপন কুমার ঘোষ

জন্মভিত্তিক জাতি ও বর্ণ এবং রামের শক্তিপথ

তপন কুমার ঘোষ

উৎসর্গ

যিনি সারাজীবন ধরে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছেন, যাঁর জীবন ও আচরণে সর্বদাই আদর্শের প্রতিফলন আমার মনে শক্তি জুগিয়েছে, সেই শ্রদ্ধেয় শ্রী **অমিতাভ ঘোষ**-এর করকমলে।

মুখবন্ধ

আমাদের এই বাংলা প্রগতিশীল রাজ্য। তাই এখানে জাত-পাত নেই। এই কথাটা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু পুরোপুরি স্বীকারও করি না। জাতপাতের হানাহানি নেই, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবটাও কম। কিন্তু জাতের অস্তিত্বও আছে, ভেদাভেদও বেশ কিছুটা আছে। এই ভেদাভেদের কুফলেই ১৯৪৭-এ বাংলাভাগ ত্বরান্বিত হয়েছিল। এই জাতিগত ভেদাভেদ দলিত-মুসলিম ঐক্যের ছদ্মবেশে পুনরায় বাংলা ভাগ করতে পারে। তাই এ আলোচনা প্রয়োজন। বাংলা বলতে আমি দুই বাংলার হিন্দুকেই বুঝি। বাঙালি হিন্দু নিয়ে যে কোন আলোচনাতে দুই বাংলার হিন্দুর মধ্যে আমি কোন তফাৎ করি না।

আমাদের বাংলায় উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মত অনগ্রসর বর্ণ বা জাতির লোকের প্রতি ততটা ঘৃণা বা হিংসা হয়ত নেই, কিন্তু তাই বলে নিজেদের সামাজিক অবস্থান থেকে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা নিতেও ছাড়ে না এবং শোষণ ও বঞ্চনা করা থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। আবার শিক্ষা ও চাকরিতে জাতিগত সংরক্ষণের ফলে বিপরীত প্রক্রিয়াও আছে। তার ফলে সামাজিক ভেদ বা দূরত্ব আছেই। এই ভেদ উপর থেকে সহজে চোখে পড়ে না। আমাদের প্রতিবেশী মুসলিম ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তাদের জেহাদী আগ্রাসনের সামনে পড়ে বাংলার হিন্দুরা তাদের নিজের মধ্যে এই দূরত্বকে বেশ কিছুটা অনুভব করতে পারছে। এই দূরত্ব বা ভেদাভেদের কারণেই হিন্দুদের সামাজিক ঐক্য গড়ে উঠছে না, এবং প্রতিবেশী মুসলিম সমাজের আগ্রাসী কার্যকলাপের সামনে পড়ে শুধু মার খাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে, জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে।

তাই হিন্দুসমাজে জাত-পাত-বর্ণ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে এড়িয়ে না গিয়ে তার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। "স্বদেশ সংহতি সংবাদ" মাসিক পত্রিকায় পাঁচটি সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে এক করে এই ক্ষুদ্র সঙ্কলন। আরও একটি লেখা যুক্ত করেছি। এই সঙ্কলনকে পুস্তক আকারে ছাপতে "সেভ ইন্ডিয়া মিশন" আর্থিক সহায়তা করে আমার কাজকে সুগম করে দিয়েছেন। তঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখক

রথযাত্রা, ১৪২১

জাতি ও বর্ণ

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে জন্মভিত্তিক জাতি ব্যবস্থা বা বর্ণব্যবস্থা আমি মানি না। কিন্তু আমি না মানলে কী হবে, অনেকেই যে মানে। সেজন্যই তো এত সমস্যা। যারা মানে, তারা অনেকেই না বুঝে মানে। তাই এ বিষয়ে একটু আমার চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করতে চাই।

অনেকেই জাত ও বর্ণ গুলিয়ে ফেলে বা এক করে দেখে। কিন্তু এ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ণ আছে (ছিল) মাত্র চারটি, জাত শত শত। এছাড়া, জাত হয় একটি নির্দিষ্ট কর্ম বা পেশা ভিত্তিক। যেমন কামার, কুমোর, ছুতার, চামার, জেলে, তাঁতী, তেলি, তিলি, গোয়ালা, সোনার (স্বর্ণকার) প্রভৃতি। এরকম অসংখ্য জাতি আছে। তার মধ্যে এই ক'টিকে বেছে নিলাম কেন? কারণ এগুলির নাম দিয়েই তাদের কর্ম বা বৃত্তি বা পেশা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে বাকী জাতিগুলিও কর্ম বা বৃত্তি ভিত্তিকই হবে। তারা অনেকদিন ধরে অন্য বহুরকম কাজে বা বৃত্তিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে আজ হয়ত সেইসব জাতির নাম শুনে সঠিকভাবে তাদের কর্ম বা বৃত্তি বোঝা যায় না। কিন্তু শুরুতে সেই রকমই ছিল। দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক : মাহিষ্য ও কায়স্থ। এই জাতির লোকেরা এখন দুনিয়ার সবকিছুই করে। কিন্তু আদিতে মাহিষ্যদের কর্ম ছিল কৃষিকাজ ও কায়স্থদের কর্ম ছিল করণিক বা কেরাণীর কাজ। এই জাতিগুলির মধ্যে বড় ছোটর কোন ক্রম আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নেই। তাই এ নিয়ে তেমন সমস্যাও নেই। কামার বড় না কুমোর বড়—কে বলবে? যদি বা বলে, কী ভিত্তিতে বলবে? কোন ভিত্তি নেই। কুমোর বড় না ছুতার বড়? ছুতার বড় না লোহার (কর্মকার) বড়? তেলি বড় না তিলি বড়? জেলে বড় না গোয়ালা বড়? স্বর্ণবণিক বড় না গন্ধবণিক বড়? কিছুতেই বলা যাবে না। সবাই নিজের জাতিকে বড় মনে করতে পারে। অনেকে করেও। এবং একটু পুরাতনপন্থীরা ছেলেমেয়েদের বিবাহ নিজেদের জাতির মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এইরকম বৃত্তি বা পেশাভিত্তিক কোন জাতিকে বড় বা ছোট, উঁচু বা নীচু বলার জন্য কোনরকম শাস্ত্রীয় বিধান কেউ দেখাতে পারবে না।

কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সেখানে শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বা প্রমাণ দেখিয়ে চারটি বর্ণের মধ্যে ছোট-বড় বা উঁচু-নীচু দেখানোর একটা চল সমাজে আছে। যদিও স্পষ্টভাবে কোথাও বলা নেই যে কোন বর্ণ বড় বা কোন বর্ণ ছোট। খুব বেশী করে উল্লেখ করা হয় একটি শ্লোকের। ওই শ্লোকটিতে আছে—সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্র। সুতরাং মানবশরীর মাথা, হাত, পেট ও পায়ের অবস্থান অনুসারে উঁচু-নীচু, বড়-ছোট নির্ধারিত হয়ে গেল। নির্ধারিত হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ সব থেকে উঁচু, শূদ্র সব থেকে নীচু। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দুইয়ের মাঝখানে। যে উঁচু তাকে তো শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্য-গণ্য করতে হবে। আজ থেকে দু-চারশো বছর আগে পর্যন্ত তাই করত। এ নিয়ে বিশেষ কোন প্রশ্ন বা আপত্তি কেউ করেনি। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই। অনেক আপত্তি উঠেছে। এই আপত্তি প্রায়শঃই ঝগড়া ও বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তা থেকে হয়েছে মনোভেদ। তা থেকে বিদ্বেষ। এবং শেষ পর্যন্ত তা আমাদের সমাজকে ভাঙার কাজই করেছে ও করছে। তাই এ বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। এর একটা সুষ্ঠু সমাধান হওয়া দরকার। বিষয়টা নিঃসন্দেহে জটিল।

জাতি ও বর্ণ। দুটো কি এক? কখনই নয়। মিলও আছে, অমিলও আছে। মিল হচ্ছে দুটোই জন্মভিত্তিক। ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র হয়েও ব্রাহ্মণ হয়, তেমনি কামারের বা গোয়ালার ছেলে নামকরা ডাক্তার হয়েও জাতিতে কামার বা গোয়ালাই থেকে যায়, তার জাতি "বদ্যি" হতে পারে না। জাতি ও বর্ণে এই হচ্ছে মিল। অমিলটা কোথায়? অমিল হচ্ছে এই যে, জাতি একটি নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি ভিত্তিক। কিন্তু বর্ণের মধ্যে নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি উল্লেখ করা হয়নি। বর্ণের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে গুণ ও কর্ম (গুণ কর্ম বিভাগ : গীতা ৪ অধ্যায়)। এর মধ্যে গুণ শব্দটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু কর্ম শব্দটা অত সহজ নয়। অধিকাংশ লোকেই কর্ম শব্দে কাজ বা বৃত্তি বা পেশাকেই মনে করছে।

কিন্তু গীতায় ভগবান কর্ম বলতে বৃত্তি বা পেশাকে বুঝিয়েছেন—সেকথা কোনভাবেই জোর দিয়ে বলা যাবে না। যখন কাউকে বলা হয়—সে তার কর্মফল ভোগ করছে তখন কি কর্ম মানে পেশা বলা হয়? কখনই না। এখানে বোঝানো হয় যে সে কাজ করতে গিয়ে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত যা করেছে, তার ফল ভোগ করছে। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক। সমান অবস্থাসম্পন্ন দুজন চাষী পাশাপাশি জমিতে ধান চাষ করছে। একজনের ফলন ভাল হল, আর একজনের ফলন কম হল। কারণ সহজ। দুজনই যদি বীজ, সার, সেচ একই রকম দিয়ে থাকে, তবুও যে পরিশ্রম বেশী করেছে, ফসলের যত্ন বেশী করেছে—তার ফলন বেশী হয়েছে। অন্যজনের কম হয়েছে। অর্থাৎ দুজনেই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ফল পেয়েছে। একেই বলে কর্মফল। এখানে কর্ম মানে তো পেশা বা বৃত্তি নয়। এক্ষেত্রে তো দুজনেরই পেশা ও বৃত্তি একই। এমনকি কাজও এক! অথচ কর্মফল আলাদা। সুতরাং এখানে কর্ম মানে একটি নির্দিষ্ট কাজ বা পেশা বা বৃত্তিকে বোঝাচ্ছে না। কর্ম বলতে কাজের গুণাগুণকে বোঝাচ্ছে। মহাভারতে যুধিষ্ঠির তাঁর কর্মফলে সশরীরে স্বর্গে পৌঁছলেন। আর চার ভাই তো পৌঁছতে পারলেন না! কেন? তাঁদের সকলের কর্মই তো একই ছিল! না, ছিল না। পেশা এক ছিল, বৃত্তি এক ছিল, কাজ (যুদ্ধ) এক ছিল। কিন্তু কর্ম হয়ে গেল আলাদা, তাই কর্মফলও আলাদা। রাজ্যভোগ ও রাজ্যত্যাগ, বনবাসের কষ্ট, অজ্ঞাতবাসের অপমান সহ্য করা, যুদ্ধ করা—পাঁচ ভাই-ই একসঙ্গে একইরকমভাবে করেছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই সকল একই কাজ করেছেন অধিক নিঃস্বার্থভাবে, অধিক বৃহত্তর স্বার্থে, অধিক ঈর্ষাশূন্যভাবে, অধিক ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে এবং সর্বোপরি অধিক সততার সঙ্গে। তাই একই কাজ করেও তাঁর কর্মফল ভিন্ন হয়ে গেল অন্য ভাইদের থেকে।

তাহলে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যখন বলছেন যে, তিনিই গুণ ও কর্ম অনুসারে চর্তুবর্ণ সৃষ্টি করেছেন, সেখানে কর্ম বলতে কর্মের এই ব্যাখ্যাকে না মেনে পেশা বা বৃত্তিকে ধরে নেওয়াই সঠিক—একথা জোর দিয়ে বলা যায় কি?

তাহলে কর্মের দুটো মানে হতে পারে—পেশা ও কাজের গুণাগুণ। গীতায় বলছেন যে, গুণ ও কর্ম অনুসারে তিনি চার বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। জন্ম অনুসারে বা জন্মের ভিত্তিতে করেছেন—একথা ভগবান মোটেই বলছেন না। এর উল্টো যুক্তিটা বোধহয় এরকম যে—জন্ম অনুসারেই বা জন্ম থেকেই ব্যক্তির মধ্যে ভগবান ওই গুণ ও কর্মগুলো ভরে দিয়েছেন বা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই যুক্তিটাই অন্যভাবে বললে এরকম হয়। শিশুর জন্মের সময়ই বিভিন্ন জনকে আলাদা আলাদা রকম গুণ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য আলাদা আলাদা কর্ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে ভগবানের দ্বারা। ভগবানের ঘাড়ে দায়ভাগ একটু কম চাপাতে হলে এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারে এজন্মে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করছে। এই দুটো ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছাতেই হোক বা পূর্ব্বজন্মের কর্মফলই হোক, একজন একটা বর্ণে যখন জন্মগ্রহণ করে ফেলেছে তখন তার মধ্যে ঐ গুণ আছে ও ঐ পেশার যোগ্যতা আছে—এটাই মেনে নিতে হবে। আর সেই অনুসারেই তথাকথিত উচ্চবর্ণ বেশী শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী, আর তথাকথিত নিম্নবর্ণ কম শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী। ভারতের গ্রামাঞ্চলে বহুলাংশে এই প্রথা এখনও চলে আসছে। এই প্রথা অনুসারে এম.এ. পাশ সচ্চরিত্র বাগদি যুবককে ব্রাহ্মণের গণ্ডমূর্খ, গাঁজাখোর সন্তানকে শ্রদ্ধা করতে হবে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে।

বেশী যুক্তিতর্কে, ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটা বলতে চাই যে, এটা আর চলবে না। জন্মের ভিত্তিতে শ্রদ্ধা আদায় বন্ধ করতে হবে। যারা আমার এই কথা মানতে পারবে না, তাদের সঙ্গে বেশী তর্ক না করেও আমি বলতে চাই যে—শহরে তো বেশীরভাগ লোকই এটা মানে না। আর যে গ্রাম যত অনগ্রসর (backward), সেই গ্রামে তত বেশী এই প্রথা মানুষ মানে। তাহলে আপনি শহর ছেড়ে সেই গ্রামে চলে যান এবং আপনার সন্তানদেরকেও কখনো শহরে না নিয়ে এসে সেই গ্রামেই রাখুন যেখানে এই প্রথা মানা হয়। শহরে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, যে উন্নত নাগরিক পরিষেবার সুযোগ শহরে করা গিয়েছে—তা ওই প্রথাকে বাতিল করে তবেই করা গিয়েছে। শিক্ষা, উৎকর্ষ অর্জন ও কর্মের সুযোগ

জন্মের ভিত্তিতে না পেয়ে মেধা ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে পাওয়ার ফলেই আজকের এই উন্নত নাগরিক পরিষেবা তৈরি করা গিয়েছে। এই নাগরিক পরিষেবা গ্রহণ করতে হলে গ্রহীতাকে জন্মভিত্তিক তারতম্য করা, ভেদাভেদ করা ত্যাগ করতে হবে। জাতি নিরপেক্ষ এই পরিষেবা গ্রহণ করব, আবার মানুষের বিচার বা মূল্যায়ন করব তার জাতি সাপেক্ষে—এই দু'রকমের মাপদণ্ড (Double Standard)চলবে না। মেধা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সততাকে গুরুত্ব দিতেই হবে—জন্মের থেকে বেশী গুরুত্ব।

ব্রাহ্মণ

আমার বিচার, বুদ্ধি ও বোধ অনুসারে জন্মভিত্তিক বর্ণ বা শ্রেণী বাতিল বা অচল। যদি কোন শ্রেণী থাকতেই হয় তবে তা হবে কর্ম ও গুণ অনুসারে। তাই একালে ব্রাহ্মণ হবে সে যে সর্বদা সমাজের মঙ্গলকর্মে নিযুক্ত থাকবে নিজের স্বার্থ ও সুখ জলাঞ্জলি দিয়েও। শ্রীরামকৃষ্ণের বিচার করব না। কিন্তু তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন চট্টোপাধ্যায় উপাধির জন্য নয়। তিনি জমিদারের চাপ ও হুমকিতেও আদালতে মিথ্যে সাক্ষ্য না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে। আর ঠাকুরেরই নিজের ভাগ্নে হৃদয় সবসময় ঠাকুরকে বিষয়বুদ্ধি দেয়ার চেষ্টা করত। ঠাকুরকে বৈষয়িক লাভের দিক বোঝানোর চেষ্টা করত। তাই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হলেও সে ব্রাহ্মণ নয়। এরকম উদাহরণ অসংখ্য।

যে ব্যক্তি নিরন্তর সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, সে-ই ব্রাহ্মণ। এছাড়াও ব্রাহ্মণের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। একটা সংজ্ঞা প্রায়ই বলতে শোনা যায়, "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ", যে ব্রহ্মকে জানে সে-ই ব্রাহ্মণ। আমার মনে হয় এটা খুব বাস্তব সম্মত সংজ্ঞা নয়। ব্রহ্মকে জানা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়া নিশ্চিতভাবে এত সহজ নয়। খুবই দুর্লভ। তাই ব্রাহ্মণের অন্য বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা তৈরী করার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এইগুলিকে অস্বীকার করলে বা করতে পারলে, এসব সংজ্ঞার কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু অস্বীকার না করতে পারলে নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন আছে। আগে বলা হতো যজন-যাজন-অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কাজ। এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যাজনটা (পৌরোহিত্য) অনেকাংশে ব্রাহ্মণের হাতে থাকলেও, যজন(গুরুগিরি) ও অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণের একাধিকার আর কোনভাবেই নেই। অব্রাহ্মণ স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে বহু অব্রাহ্মণ ধর্মগুরু গুরুর ভূমিকা পালন করেছেন, দীক্ষা দিয়েছেন ও দিচ্ছেন, আর প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত তো প্রায় বিশ্বগুরুর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তাঁর জন্মও অব্রাহ্মণ পরিবারে। গার্হস্থ্য আশ্রমে তাঁর নাম ছিল অভয়চরণ দে। সুতরাং, গুরুগিরিতে (যজন) অব্রাহ্মণের রমরমা। তারপর অধ্যাপনা। সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, লাডলি মোহন মিত্র, কেশবচন্দ্র নাগ, সুকুমার সেন প্রভৃতি বহু কিংবদন্তীতুল্য শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সুতরাং, ব্রহ্মকে জানা দিয়ে বা যজন-যাজন-অধ্যাপনা পেশা দিয়ে বর্তমানে কালে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা অথবা শ্রেণী নির্ণয় করা যাবে না। জ্ঞানচর্চাও সব শ্রেণীর মানুষই করেন। তপস্যা ও সাধনা সকলেই করেন—সকলেরই অধিকার। মীরাবাঈ, কনকদাস, রবিদাস থেকে শুরু করে আমাদের ঘরের নরেন পর্যন্ত অখণ্ড প্রবাহ সব জাতির, সব বর্ণের মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার। তাহলে কাকে ব্রাহ্মণ বলব? (যদি বলতেই হয়, বলাটা আবশ্যিক নয়)।

আমার মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থে বা প্রয়োজনে নয়, ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসা নিবারণেও নয়, শুধুমাত্র সমাজের মঙ্গল কামনায় যে ব্যক্তি নিরন্তর জ্ঞানচর্চা করে এবং সেই জ্ঞানচর্চার ফলকে সমাজের জন্য উৎসর্গ করে সে ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। একজন আদর্শ শিক্ষক অবশ্যই ব্রাহ্মণ। কিন্তু স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনি করা শিক্ষক ব্রাহ্মণ নন। অনেক শিক্ষকই পাল্টা যুক্তি দেবেন যে, শিক্ষকের কি একটু সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রয়োজন নেই? এসব ছেঁদো যুক্তি। বহু যুক্তি দিয়ে এ যুক্তিকে কাটা যায়। সেই পাল্টা যুক্তিতে যাচ্ছি না। আসল কথাটা হল—ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্য বিপুল রোজগার করব, আবার সমাজের শ্রদ্ধাও দাবী করব—এ দু'টো একসঙ্গে চলতে পারে না।

আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই অপূর্ব সূত্রটি আবিষ্কার/তৈরী করেছিলেন যে, যেকোন ব্যক্তি সমাজে ভোগ এবং শ্রদ্ধা সমানুপাতে পাবে না, ব্যস্তানুপাতে পাবে। অর্থাৎ ভোগে নিষেধ নেই। কিন্তু ভোগী ব্যক্তি সমাজে শ্রদ্ধার দাবীদার হবে না। শ্রদ্ধাস্পদেষু ভোগী হবে না। যে যত বেশী পার্থিব সুখ ভোগ করবে (নিষেধ নেই), সমাজ থেকে সে তত কম শ্রদ্ধা পাবে। যে যত সমাজে শ্রদ্ধা চাইবে, তাকে তত বেশী ত্যাগ করতে হবে বা পার্থিব সুখভোগ কম করতে হবে। প্রকৃতির এমনই নিয়ম, সকল মানুষের মধ্যেই এই দু'টোরই চাহিদা

আছে। কারো কোনটা কম, কারো কোনটা বেশী। সবাই যদি শুধু ভোগের পিছনে ছোটে, তাহলে অবশ্যই অনেকে বঞ্চিত হবে ও শুকিয়ে মরবে। কারণ দৌড়ের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। সমান নয় বলেই ইউরোপ সূত্র আবিষ্কার করেছে "Survival of the fittest"। অর্থাৎ যোগ্যতম ব্যক্তিই টিকে থাকবে। অন্যরা টিকবে না। সুতরাং অযোগ্যদের নিশ্চিহ্ন হতে হবে। এটাকে মানবিকতা বা মানব সভ্যতার উৎকর্ষ বলে আমরা মেনে নিইনি। যোগ্যতম, যোগ্যতর, যোগ্য ও অযোগ্য সকলেই টিকে থাকবে, বেঁচে থাকবে আমাদের সভ্যতার সূত্র গ্রহণ করলে। এক পিতার চার সন্তানের মধ্যে একজন যদি কম মেধা-বুদ্ধিসম্পন্ন হয় বা অযোগ্য হয়, তাহলে তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে—মা বাবা কি তা চাইবেন? অথবা অন্য তিন যোগ্য সন্তানও কি চাইবে তাদের চার ভাইবোনের মধ্যে একজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক? চাইবে না। পারিবারিক টান এবং আপনত্ববোধ তাদেরকে বিরত রাখবে। তাহলে আমি নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে আমার অযোগ্য ভাইটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এটা যদি মেনে নিতে না পারি, তাহলে সমাজে অন্যদের অযোগ্য ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক—এটা কামনা করা কি উচিত বা মানবিক? নিশ্চয় নয়। সকলেই নিজের অযোগ্য ভাইটিকে বা সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং যতটুকু সম্ভব সুখেও রাখতে চায়। তাহলে সমাজে এই সমস্ত অযোগ্য সন্তান বা ভাইদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ও অন্ততঃ অল্প হলেও সুখে রাখার একটা পদ্ধতি তো বের করা দরকার। হাজার হাজার বছরের পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের ঋষিরা সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যা হল Survival of All, Survival of the only fittest নয়। এবং এই "All" শুধু আমাদের দেশ ও সমাজের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গোটা বিশ্বকে আমরা এই পদ্ধতি শেখানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম, সঙ্কল্প করেছিলাম। সেই স্বপ্ন ও সঙ্কল্পের শব্দরূপ/সূত্র ছিল **'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম'**।

এখন আসা যাক সকলকে বাঁচিয়ে রাখার, সকলকে সুখে রাখার সেই পদ্ধতিটা কী? আমাদের এই পদ্ধতি এক গভীর দৃঢ় আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হল অদ্বৈতবাদ এবং শিখর হল অদ্বৈত অনুভূতি। অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে সমাজের জন্য সূত্র রচনা হয়েছিল 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। পদ্ধতি তৈরী হয়েছিল চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম। আর নীতি বা মূল্যবোধে তৈরী হয়েছিল—পার্থিব সুখ ও সামাজিক শ্রদ্ধা বিপরীত অনুপাতে প্রাপ্তি। একটি প্রাকৃতিক সূত্রকে মনে রেখে এই নীতি বা মূল্যবোধটি তৈরী হয়েছিল। সেই সূত্রটি হল : মানুষের বহুপ্রকার চাহিদা বা বাসনার মূল তিনটি—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং যশৈষণা বা লোকৈষণা। এই প্রাকৃতিক সূত্রকে মনে রেখে সমাজের সমস্ত মানুষের, এমনকি সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক দর্শনকে (অদ্বৈত) ভিত্তি করে এক অপূর্ব সমাজ ব্যবস্থা রচনা করেছিলেন আমাদের ঋষিমুনিরা। বহু হাজার বছর, হয়তো বা বহু লক্ষ বছর এই সমাজব্যবস্থা মানুষকে সুখে ও শান্তিতে রেখেছিল। শুধু ভারতে নয়, সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। তারপর বহিরাক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বহুদিন সুখে শান্তিতে থাকা এই সমাজ ও তার ব্যবস্থা। আরও নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল আমাদের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার, পাঠাগারে পুস্তক সম্ভার ও গবেষণালব্ধ ফলসমূহ। নির্মমভাবে নিহত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন জ্ঞানের ধারক ও বাহকরা। এই ধ্বংসলীলা উত্তর ভারতে অতি প্রবল, অন্যত্রও যথেষ্ট। বেশী বর্ণনায় না গিয়েও শুধু একটি উদাহরণ বা প্রমাণই যথেষ্ট। উত্তর ভারতে একটিও প্রাচীন মন্দির পুরাতন স্থাপত্যসহ নেই, একটিও প্রাচীন নৃত্যকলা নেই, একটিও বংশপরম্পরায় বেদাধ্যায়ী পরিবার নেই। এ সবই দক্ষিণ ভারতে আছে। উত্তর ভারতে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত ঘরানাটা বেঁচে আছে। তার কারণও সম্ভবতঃ তানসেন তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই বহুযুগের সঙ্গীত সাধনার অমূল্য সম্পদকে সমগ্র মানবজাতির জন্য বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন বলে। অন্ততঃ আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তানসেন শুধু বাহ্যিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভিতর থেকে নয়। আরও অনেক সঙ্গীত সাধক বর্বর মুসলিম রাজত্বকালে এই পদ্ধতি নিয়েছিলেন। তাই আজও আমাদের স্বর-সাধনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন। তাই আজও বহু মুসলিম সঙ্গীত সাধকের ঘরে দেবী সরস্বতীর পূজা হয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কন্যার নাম হয় অন্নপূর্ণা।

ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ শেষ করার আগে একটা কথা উল্লেখ করতেই হবে। হাজার হাজার বছর ধরে ব্রাহ্মণরা যে আমাদের সমাজে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন, তা শুধু তাঁদের শাস্ত্র নির্ধারিত সামাজিক অবস্থান বা শ্রেণীবিন্যাসের জন্যই পেয়েছেন তা নয়। তাঁদের মধ্যে বহুজনই সত্যিই সমাজের মঙ্গল কামনায় ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমূর্তি ছিলেন, তাই শ্রদ্ধা পেয়েছেন। কিন্তু গত ৩-৪ হাজার বছর আগে থেকেই সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে বলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যযুগে ইসলামিক শাসনের সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ভক্তিমার্গ আধারিত আরও অনেক সম্প্রদায় হিন্দুধর্মের মধ্যে তৈরী হয়েছে। ইসলামের প্রচণ্ড অত্যাচারের মধ্যেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা ধরে রাখতে এই সম্প্রদায়গুলির অবদান অনন্য। এই বৌদ্ধমত এবং ভক্তিমার্গ আধারিত সম্প্রদায়গুলির প্রভাবের ফলে সমাজে বর্ণপ্রথাও ঢিলে হয়েছে। এবং ব্রাহ্মণদের প্রাসঙ্গিতাও অনেক কমে গিয়েছে। আর আজ তো সেই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এই পরিবর্তনে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, ভোগ্যপণ্যের গণ-উৎপাদন ও সহজলভ্যতা, কম্পিউটার, গুগল সার্চ ও উইকিপিডিয়ারও বড় অবদান আছে। তাই আজকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে শুধু সেই সব ব্যক্তি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজের মঙ্গলকামনাযুক্ত কর্মে রত এবং তার জন্য পার্থিব ভোগ-সুখ থেকে স্বেচ্ছায় নিবৃত—জন্ম তার যে কুলেই হোক না কেন।

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয় মানে যে ব্যক্তি সমাজকে ক্ষত থেকে রক্ষা করে। কিন্তু এই সংজ্ঞাও পূর্ণ নয়। যে ব্যক্তি সমাজকে বাইরের ক্ষত থেকে রক্ষা করে সে-ই ক্ষত্রিয়। ভিতরের ক্ষত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব ক্ষত্রিয়ের নয়। সে দায়িত্ব সমগ্র সমাজের। বাইরের ক্ষত আসে বাইরে থেকে। অর্থাৎ বাইরের আক্রমণ থেকে। তাই বহিরাক্রমণ থেকে সমাজকে রক্ষা করা হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের কাজ বা দায়িত্ব। এই কাজকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে ও সমাজে। প্রকৃতপক্ষে সব দেশেই দেওয়া হয়। তাই আমাদের দেশে রাজা হতেন ক্ষত্রিয়রা। শুধু ক্ষত্রিয়রা। সেইজন্য ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় সমস্যা হয়েছিল। পুণের ব্রাহ্মণরা শিবাজীর রাজ্যাভিষেক করতে অস্বীকার করেছিলেন এই কারণে যে শিবাজীর বংশ ক্ষত্রিয় বংশ নয়। সেই ব্রাহ্মণরা অবশ্যই রূঢ়িবাদী ছিলেন এবং সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনাহীন ছিলেন। ঠিক সেইরকমই উনবিংশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের নির্বোধ ব্রাহ্মণরা কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে বাধা দিয়ে ভারতের সর্বনাশ করেছিলেন। শিবাজীর ক্ষেত্রে বারাণসী থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গাগা ভট্ট এসে তাঁর রাজ্যাভিষেক করেছিলেন, পুণের পণ্ডিতরা করেননি। যাইহোক, এদেশে প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়রা রাজা হতেন। তাই তাঁদের আর এক নাম রাজপুত, অর্থাৎ রাজার পুত্র। এই ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতি অনেক বংশ ছিল। এঁরাই রাজা এবং এই সকল বংশেরই লোকেরা বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতেন। অর্থাৎ যুদ্ধ করাই ছিল ক্ষত্রিয়ের কাজ। কিন্তু এই প্রথা সর্বত্র ছিল না। কারণ, বর্ণাশ্রম প্রথা সারা ভারতে সমানভাবে প্রচলিত ছিল না। রাজা জনকের আচরণ ব্রাহ্মণের মত বা ঋষির মত ছিল। তাই তিনি ক্ষত্রিয় রাজা হয়েও রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হতেন। কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালি বা সুগ্রীব ক্ষত্রিয় বংশ ছিলেন কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। সব থেকে বড় উদাহরণ রাবণ। রাবণ তো লঙ্কার রাজা ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। অর্থাৎ রাবণ বর্ণাশ্রম প্রথা না মেনে রাজা হয়ে বসেছিলেন। এছাড়া আমাদের অনেক জনজাতির মধ্যেও বর্ণাশ্রম প্রথা চালু ছিল না। তাদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে রাজা মনোনীত হতেন। এইসব জনগোষ্ঠীতে বাইরের আক্রমণ রোখার দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট অংশের উপর থাকত না। এই জনগোষ্ঠীর সবাই সেই আক্রমণ প্রতিরোধে বা লড়াইতে অংশগ্রহণ করত। সুতরাং এইসব জনজাতি জনগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তিকেই ক্ষত্রিয়ের কাজ করতে হত। তাই এই জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে আজও ক্ষত্রিয় গুণ বা বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। এছাড়া কাশীর ডোমরাজা, আমাদের হুগলির বাসন্তী বালিয়া রাজ্যের বাগদী রাজা, প্রভৃতি অনেক অ-ক্ষত্রিয় রাজার উদাহরণ আছে।

যাইহোক, ক্ষত্রিয়ের কাজ যুদ্ধ করা, দেশরক্ষা করা এবং রাজ্য জয় করা। একটা ভুল কথা হিন্দুত্ববাদীরা প্রচার করেন যে হিন্দুরা পররাজ্য আক্রমণ করে না ও জয় করে না। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের ক্ষত্রিয় রাজারা অন্যের রাজ্য আক্রমণ ও জয় করতেন রাজ-চক্রবর্তী উপাধি অর্জনের জন্য, এই আক্রমণের জন্য সব থেকে ভাল দিন হিসাবে গণ্য হত বিজয়া দশমীর দিন। নবমীর দিন শস্ত্রপূজা করে দশমীর দিন বিজয় যাত্রা শুরু। তাই বিজয়া দশমী তিথিকে ক্ষত্রিয় রাজারা সীমোল্লঙ্ঘন দিবস হিসাবে পালন করতেন। ওইদিন তাঁরা নিজেদের রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতেন, পররাজ্যের সীমানা উল্লঙ্ঘন করতেন। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে আমি 'বিজয়া দশমী' প্রবন্ধে লিখেছি।

এই রাজ্য জয়, রাজ্য রক্ষা ও যুদ্ধের জন্য ক্ষত্রিয়রা হত অকুতোভয়, সাহসী, শক্তিশালী। সবথেকে বড় কথা—তারা ছিল মৃত্যুভয়হীন। এই যে তারা মৃত্যুকে ভয় করত না—এর পিছনে দুটো কারণ ছিল। (১) তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল প্রবল। কর্তব্য পালনের জন্য প্রাণও তাদের কাছে তুচ্ছ ছিল। (২) আমাদের ধর্মের সর্বোচ্চ মানবিন্দুতে তাদের আস্থা ছিল গভীর। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার মৃত্যু নেই। মানুষ শুধু শরীর নয়, মানুষ আত্মা। মৃত্যু হলে শরীরের মৃত্যু হবে, আমার নয়। এই বিশ্বাসে তারা মৃত্যুভয়হীন হয়ে যুদ্ধে এগিয়ে যেত। আর এটা তো জানা কথা, মৃত্যুর পরোয়া না করে যে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধে সে-ই জিতবে। তাই আমাদের সেনাবাহিনী ছিল বিশ্বে অপরাজেয়। আমাদের বর্ণাশ্রম

প্রথা নষ্ট হয়ে যাওয়ার বহুশত বছর পরেও এ পরিচয়, এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে যে ভারতীয় সৈন্যরা লড়েছিল, তাদের বীরত্ব কাহিনী আজও বিশ্বের যুদ্ধের ইতিহাসে Legend হয়ে আছে। কৃতজ্ঞ বৃটেন আজও তার স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে। হিটলারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অপরাজেয় সেনাপতি রোমেলকেও যুদ্ধে হারিয়েছিল ভারতীয় বাহিনী।

ক্ষত্রিয়দের বীরত্বের কাহিনী আমাদের দেশের মহাকাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যে ভরপুর। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রাজকাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা রাজসিংহ, রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা রাজপুত জীবন সন্ধ্যা প্রভৃতি উপন্যাসেও প্রচুর। তাদের বীরত্ব, পরাক্রম, প্রতিজ্ঞাপালন, দান, দুর্বল ও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করা, কোন আহ্বান (Challenge)কে প্রত্যাখ্যান না করা, যুদ্ধে পিঠ না দেখানো, নিরস্ত্র শত্রুর উপর অস্ত্রাঘাত না করা—এ সমস্ত ছিল ক্ষত্রিয়ের আচরণের বৈশিষ্ট্য। এর নামই ক্ষাত্রধর্ম।

অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি যে আমাদের ঋষিমুনিদের ধারণায় 'ধর্ম' মানে শুধু আধ্যাত্মিকতা, ভগবৎপ্রাপ্তির প্রচেষ্টা, পৃথকভাবে ভগবৎভজনা, ভগবৎসাধনা, নাম-সঙ্কীর্তন, পূজা-পাঠ, জপ-ধ্যান নয়। সর্বসাধারণের কাছে 'ধর্ম'-এর কী অর্থ হওয়া উচিত—তা বুঝতে হলে সর্বসাধারণের প্রচলিত ভাষায় প্রচলিত—রাজধর্ম, প্রজাধর্ম, পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, পতিধর্ম, পত্নীধর্ম, ছাত্রধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম, ধর্মকাঁটা, ধরম হাসপাতাল প্রভৃতি শব্দগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে। এই প্রত্যেকটি শব্দ দিয়ে কর্তব্য বা কর্মকে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন পূজাপদ্ধতি জপতপ-কে নয়।

ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে হরিশচন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য শ্মশানে ডোমের কাজ করেছেন, রামচন্দ্র ১৪ বছর বনবাস ভোগ করেছেন, পাণ্ডবরা ১৩ বছর বনবাস ও অজ্ঞাতবাস ভোগ করেছেন, যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের পাশাখেলার আহ্বানকে অস্বীকার না করে সর্বস্ব খুইয়েছেন, শিবিরাজা শরণাগত পায়রাকে আশ্রয় দিতে নিজের উরু থেকে মাংস কেটে দিয়েছেন, কর্ণ নিজের প্রাণরক্ষাকারী কবচকুণ্ডল পর্যন্ত দান করে দিয়েছেন, মহারাণা প্রতাপ ১২ বছর জঙ্গলে থেকে ঘাস-বীজের রুটি খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। এসবই হল ক্ষত্রিয়ের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করাই হল ক্ষাত্রধর্ম পালন।

কিন্তু এই ক্ষত্রিয়দের পথনির্দেশ করতেন ব্রাহ্মণরা ও ঋষিরা। ক্ষত্রিয় রাজা। তাঁরা রাজ্য চালাতেন। কিন্তু রাজ্য চালানোর নিয়ম ও নীতিগুলি তৈরি করে দিতেন ব্রাহ্মণরা ও ঋষিরা। তাঁদের তৈরি করা নিয়ম পালন করে রাজারা রাজ্য চালাতেন। তাই বাহুবল ও অস্ত্রশক্তিতে ক্ষত্রিয়রা বলীয়ান হলেও তাঁদেরকে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হত। শক্তিশালী ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অত্যাচারীতে পরিণত হয়। এবং বহুবার তা-ই হয়েছে। বলিরাজা অত্যাচারী হয়ে পৃথিবীকে কষ্ট দিয়েছেন। ভগবান বিষ্ণু বামন অবতাররূপে এসে বলিরাজাকে দমন করে পৃথিবীকে কষ্টমুক্ত করেছেন। দেবরাজ নহুষ অত্যাচারী হয়েছিলেন। তাঁর উপর ঋষিদের অভিশাপ পড়েছিল। ক্ষত্রিয়রা বহুবার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে অত্যাচারীতে পরিণত হয়েছিল। তাই পরশুরাম ২১ বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। কেবল ক্ষত্রিয় রমণীদের গর্ভস্থ সন্তানদের দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতির বংশরক্ষা হয়েছিল। যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি শক্তিশালী হয় অথচ নিয়ন্ত্রণহীন হয়, তাহলে তাদের অত্যাচারী হওয়ার প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্যই ক্ষত্রিয়দেরকে ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। এমন কি রাজার রাজ্যাভিষেকের সময় কুলপুরোহিত/কুলগুরু রাজার মাথায় স্বর্ণদণ্ড ছুইয়ে বলতেন 'ধর্ম দণ্ড্যোঽসি'। অর্থাৎ রাজাকে ধর্মদণ্ডের অধীন থাকতে হবে বা রাজা ধর্মের বিপরীত আচরণ করলে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। এই নীতিটি বহুলাংশে পালন করার ফলেই ভারতবর্ষের রাজারা বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশের রাজাদের থেকে অনেক বেশি জনকল্যাণকারী ছিলেন।

গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজের বর্গীকরণের ফলে অনেকদিক থেকে লাভ হয়েছিল। দুটি লাভ তো সহজেই বোঝা যায়—কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরও জীবিকার নিরাপত্তা (ইউরোপীয় নীতি "Survival

of the fittest”-এর বিপরীত) এবং বিভিন্ন বৃত্তীয় পেশায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা। উদাহরণ: —ঢাকার মসলিন, মুঙ্গেরের তরবারী ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের এই বর্গীকরণ এবং তার প্রতি Rigid থাকা—এর ফলে ভারতের একটি বিশাল ক্ষতি হয়েছে যা অপূরণীয়। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করবে। অন্যরা অন্য কাজ করবে, অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না। তাই ভারতের পশ্চিম থেকে আগত নৃশংস পাশবিক শক্তির আক্রমণ আমাদের ক্ষত্রিয় রাজারা ও তাদের ক্ষত্রিয় সেনাবাহিনী অনেকদিন রুখেছিল। কিন্তু যখন আর পারল না, ক্ষত্রিয় সেনা নিঃশেষ হয়ে গেল—তখন সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল না। কারণ শুধু ক্ষত্রিয়র কাজ তো যুদ্ধ করা, অন্যদের তো নয়! অথচ হিন্দুসমাজের বিশাল শূদ্র সমাজ, যারা ছিল শারীরিক শক্তিতে ভরপুর ও ধর্মনিষ্ঠ, তাদেরকে খুব সহজেই প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা যেত। তার ফলে সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়পূরণ করা যেত। কিন্তু এই বর্গীকরণ অথবা জন্মভিত্তিক কর্ম নির্ধারণের ফলে তা করা যায়নি। এর ফলেই আমরা হাজার বছরের পরাধীনতা ভোগ করলাম। এখনও করছি। আমরা এখনও পরাধীন। ভোট দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু নিজ সমাজকে বিধর্মীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এইখানেই ব্রাহ্মণের ব্যর্থতা। তাদের উচিত ছিল তখন আপদ্ধর্ম মেনে সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে বর্ণপ্রথাকে ঢিলে/নমনীয় করে শূদ্রদেরকেও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার জন্য রাজাকে আদেশ দেওয়া। তাঁরা তা করেননি। ঠিক এই সময় আমাদের ব্রাহ্মণরা আরও একটি ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বাপর যুগের শেষপাদে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে আগত কলিযুগে মানুষের কর্মের জন্য স্পষ্ট পথ নির্দেশ করে গেলেও সেই নির্দেশ বুঝতে ব্রাহ্মণরা সার্বিকভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, রাম ও কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন না বলেই কি তাঁদের শিক্ষা ব্রাহ্মণরা ভালভাবে গ্রহণ করেননি? আমার এই সন্দেহের আরও একটি কারণ হল, আমি নিজে এমনকিছু ব্রাহ্মণকে দেখেছি যাঁদের স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি গভীর বিতৃষ্ণা। আসল কথায় ফিরে আসি। আমাদের ক্ষত্রিয়দের কাছে যুদ্ধ মানেই ছিল ধর্মযুদ্ধ। অর্থাৎ ধর্ম মেনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতেন। যেমন, সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ না করা, একের সঙ্গে এক, অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বারোহী, রথীর সঙ্গে রথীর যুদ্ধ করা। পলায়নপর শত্রুকে আঘাত না করা। গদাযুদ্ধে কোমরের নীচে আঘাত না করা। যুদ্ধের সময় প্রতিপক্ষের প্রজাদের উপর আক্রমণ না করা। প্রজাদের সম্পত্তি নষ্ট না করা—ইত্যাদি বহু নিয়ম মেনে ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করতেন। তাই আমাদের দেশে যুদ্ধকে বলা হত ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ কথাটির দু'রকম মানে হয়। এক, ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ। দুই, ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ। যাইহোক আমাদের ক্ষত্রিয়রা ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে যে আক্রমণকারীরা এল, তারা ছিল হায়নার মত নৃশংস আর শিয়ালের মত ধূর্ত। তাদের সঙ্গে ধর্ম মেনে যুদ্ধ করতে গেলে পরাজয় ও বিনাশ ছিল নিশ্চিত। তাই হয়েছে। ইতিহাসে এর অসংখ্য উদাহরণ। একটি উদাহরণই যথেষ্ট—মহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বীরাজ চৌহান বারবার যুদ্ধে পরাজিত করে ক্ষমা করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর ঐ ঘোরী যখনই সুযোগ পেল বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে, তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ভারতের হাজার বছরের দাসত্বের সূচনা করে দিল। পৃথ্বীরাজ তার ক্ষাত্রধর্ম মেনে যুদ্ধ করেছিলেন। ভুল করেছিলেন, অন্যায় করেছিলেন। তাঁকে সেইসময় কেউ পরামর্শ দেয়নি যে অধার্মিকের সঙ্গে ধর্মাচরণ করা বিধেয় নয়। বিশেষ করে যেখানে দেশের অখণ্ডতা ও প্রজাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। এই পরামর্শ দেওয়ার কাজটাই করার কথা ছিল ব্রাহ্মণদের যা তাঁরা করতে পারেননি। অথচ মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বারবার পাণ্ডবদের দিয়ে ক্ষাত্রধর্মের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়েছেন। দু'টি উদাহরণ যথেষ্ট। এক, রথের চাকা মাটিতে বসে গেলে নিঃশস্ত্র কর্ণকে আঘাত করতে অর্জুনকে আদেশ। দুই, গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের কোমরের নীচে আঘাত করতে ভীমকে আদেশ। কর্ণ বধে অর্জুনকে আদেশ দিতে গিয়ে কৃষ্ণ স্পষ্টভাবেই অর্জুন ও কর্ণকে বলেছিলেন—ধর্মকে যে রক্ষা করে বা যে নিজে ধর্মাচরণ করে, কেবলমাত্র সে-ই অন্যের কাছ থেকে ধর্মাচরণ আশা করতে পারে। কৌরব সভায় দ্রৌপদীকে অপমানের সময়, সপ্তরথী দিয়ে অভিমন্যু বধের সময় কর্ণ ধর্মাচরণ করেননি। তাই অর্জুনের কাছ থেকেও তিনি ক্ষাত্রধর্মাচরণ আশা করতে পারেন না। রামচন্দ্রও একই

কাজ করেছিলেন, যা বুঝতে অধিকাংশ রামভক্ত অক্ষম। লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে যজ্ঞরত অবস্থায় নিঃশস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়েছিলেন। কেন? কারণ ইন্দ্রজিৎ ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে সামনে থেকে লড়াই করতেন না। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করতেন। সুতরাং রাম সহজেই স্থির করেছিলেন যে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্ম মেনে লড়াই করার প্রয়োজন নেই। রাম ও কৃষ্ণের দেওয়া এই শিক্ষা গ্রহণে পৃথ্বীরাজ চৌহান এবং আমাদের বহু রাজা ও ক্ষত্রিয় বীরেরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই আমাদের এই দুর্দশা। তাঁদের ক্ষাত্রধর্ম পালনে নিষ্ঠা হয়তো অহঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। সাভারকার একেই বলেছেন "সদ্‌গুণ বিকৃতি", যা আমাদের দেশ ও জাতির সর্বনাশ করেছে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন মহামতি চাণক্য। তাঁর বাস্তবজ্ঞান ও সক্রিয় দেশপ্রেমিক ভূমিকার জন্য গ্রীক আক্রমণের সময় থেকে আমাদের দেশ দু'হাজার বছর নিজ স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পেরেছে।

ক্ষত্রিয় ও রাজাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করতে ব্রাহ্মণরা ব্যর্থ হয়েছিলেন, এরকারণ কী? তাঁদের কি শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধির দৈন্য হয়েছিল? তা তো হওয়ার কথা নয়। প্রকৃত ঘটনা হল, ব্রাহ্মণরাই ধর্মচ্যুত হয়েছিলেন। তাঁদের স্খলন হয়েছিল। তাঁরা লোভী হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা কর্তব্যচ্যুত হয়ে যুদ্ধবিমুখ আয়েসী রাজাদের প্রিয়বাক্যই শোনাতেন। নিজ নৈতিক বল দিয়ে প্রজাশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে যুদ্ধবিমুখ ও আয়েসী রাজাদের অপসারণ করে নতুন রাজা নির্বাচিত করার দায়িত্ব ব্রাহ্মণদেরই ছিল। তা তাঁরা করেননি। এটাই তাঁদের ধর্মচ্যুতি। সন্দেহ হয়, এইসময় বণিক সমাজের স্বার্থরক্ষার জন্যও ব্রাহ্মণরা হয়ত রাজাকে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে প্ররোচিত করেছেন। এই ব্রাহ্মণ-বেনিয়া স্বার্থপর গটবন্ধনও বিদেশী আক্রমণকালে আমাদের দেশের বড় ক্ষতি করেছে। সমাজের সবাই করছে ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা, আর তাঁরা শুধু বণিক সমাজের বা ধনবানদের স্বার্থরক্ষার জন্য কর্মকাণ্ডের (পূজা-হোম ইত্যাদি) ভণ্ডামি করে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল তৈরী করেছেন। অবশ্যই সকলেই নয়। বহু ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখনও আছেন, যাঁরা ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ মানকে ধরে রেখেছেন। উদাহরণ—বুনো রামনাথ, ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। কিন্তু রাজপুরোহিত-কুলগুরু পদে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাদের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই আমাদের দেশ ও জাতির দুর্দশা।

আর একটা খুব দরকারী বিষয় বলে ক্ষত্রিয় প্রসঙ্গ শেষ করব। বিদেশী ধর্মান্ধ মুসলিম আক্রমণের ভয়াবহতা মনুষ্য কল্পনার বাইরে। মধ্যযুগে উপলব্ধ বিভিন্ন ইতিহাসের পাতায় (অধিকাংশই মুসলিম ঐতিহাসিকের লেখা) তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা জাতির আংশিক ও অসম্পূর্ণ স্বাধীনতার (১৯৪৭) পরে ব্রিটিশের থেকেও খারাপ যে শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর চেপে বসেছে, তাদের বদমাইসিতে আমাদের সেই সর্বনাশের ইতিহাস মুছে দিয়ে বংশীধারী মুসলিম আক্রমণকারীদের ইতিহাস লেখা হয়েছে ও তাই আমাদের শেখানো হচ্ছে। সেই ভয়াবহ নিষ্ঠুর, ক্রূর, পাশবিক ইসলামিক আক্রমণের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রভৃতি। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট ভারতের উপর মুসলিম আক্রমণকে বিশ্ব ইতিহাসের রক্তাক্ততম অধ্যায় (Bloodiest chapter in history) বলে অভিহিত করেছিলেন একথা বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম জানে না। বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে বলেছেন—ইসলামিক আক্রমণে হিন্দু জাতির চল্লিশ কোটি মানুষের ক্ষয় হয়েছে। ড. আম্বেদকর আরও বিস্তৃতভাবে সেই আক্রমণ, সেই নৃশংসতা, সেই জনক্ষয় ও আক্রমণকারীর ধর্মান্ধতার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর লেখা "Thoughts on Pakistan" বইতে। এই প্রচণ্ড আক্রমণের অভিঘাতটা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়র উপরেই পড়েছিল। অন্যদের উপরও পড়েছিলো, একটু কম। সেই ধ্বংসলীলায়, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেল, শাস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে গেলো শিল্প, সাহিত্য, কলা—সবকিছু। ধ্বংস হয়ে গেল বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ। আর গেল যুদ্ধ কলা ও যুদ্ধ বিদ্যা। ক্ষত্রিয়র অভাবে দেশ তো পরাধীন হয়েছেই, সমাজ হয়ে পড়ল অরক্ষিত। মঠ, মন্দির, দেবমূর্তি কিছুই অক্ষত থাকল না। দেবমূর্তি ভেঙ্গে মসজিদের সিঁড়ি তৈরী হল। আর সবথেকে বিপন্ন

হল আমাদের মাতৃজাতির সম্ভ্রম। আলাউদ্দিন খিলজী (পদ্মিনী)র সময় থেকে সিরাজদৌল্লার সময় পর্যন্ত সেই ধর্মান্ধ নারীলোলুপতার অজস্র ঘটনা আমাদের মনকে আজও কম্পিত করে তোলে। হিন্দু রমণীদের তুর্কিস্থান ও আরবের দাসবাজারে ১ দিনার-২ দিনার মূল্যে বিক্রি করত ইসলামের বিজয় পতাকাধারীরা, সেই রমণীদের পরিণতির কথা ভাবাটাও কতটা কষ্টকর। কিন্তু সেইসব ইতিহাস চাপা দিয়ে ইসলামকে এক মধুর প্রেম ও শান্তির ধর্ম হিসাবে তুলে ধরে আমাদের জাতির বর্তমান প্রজন্মের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, যার পরিণাম হবে খুবই খারাপ।

ঐ ভয়াবহ ইসলামিক আক্রমণে যে ক্ষত্রিয়রা বেঁচে গিয়েছিল, তারা মুসলিম শাসকের কাছে নতি স্বীকার করেই বাঁচতে পেরেছিল। মানসিংহ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি। এই ক্ষত্রিয়রা তাদের ক্ষত্রিতেজ হারিয়ে মুসলমানের দাসত্ব করেছে। তাদের বংশধররা এই গত কয়েকশ বছরে ক্ষাত্রধর্ম ও স্বধর্মনিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছে। রাজার জাতি দাসের জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর দাস মানসিকতার মানুষ সুযোগ পেলেই অত্যাচারী হয়। বর্তমান উত্তর ভারতে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই ক্ষত্রিয় বংশ, যারা সাধারণতঃ ঠাকুর নামে পরিচিত, তারাই অনগ্রসর জাতির উপর (SC) বেশি অত্যাচার করে। ব্রাহ্মণরা ততটা নয়। তাই বর্তমানে এই ক্ষত্রিয়রা ক্ষত্রিয় নামের কলঙ্ক মাত্র।

আজ দেশরক্ষা ও সমাজ রক্ষার কাজে নতুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন আরও অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে বর্তমান ভোট রাজনীতিতে মুসলিম ভোটের দাপটের জন্য। এই দাপট দিয়ে তারা প্রশাসনকে পঙ্গু করে রাখে মুসলিম সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে। তাই গ্রামগঞ্জের হিন্দুসমাজ আরও বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়েছে। তাই প্রয়োজন আজ নব ক্ষত্রিয়ের। এই শ্রেণীর উদ্ভব হবে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মধ্য থেকে। ক্ষত্রিয়র বহু গুণ এদের মধ্যে বিদ্যমান। তার থেকেও বেশি কিছু। এদেরকে দেখেই বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'একমুঠো ছাতু খেয়ে এরা বিশ্ব জয় করতে পারে।' ফিজি, গায়ানা প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলিতে এরা তা প্রমাণ করে দিয়েছে। উত্তর ভারতের বাল্মীকি (চর্মকার), খটিক প্রভৃতি জাতির লোকেদের শৌর্য-বীর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা—যাদের দেখার চোখ আছে তারা দেখেছে। মহারাষ্ট্রের পন্ঢারপুর যাত্রা ও কেরলের শবরীমালা যাত্রা এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্কল্প ও কষ্টসহিষ্ণুতার অপূর্ব নিদর্শন। আমাদের বাংলার অনগ্রসর জাতিগুলির কথা আমি বহুবার বহু প্রসঙ্গে বলেছি। বাগদী, কাওড়া, হাড়ী, ডোম, মাহাতো, সাঁওতাল, পৌণ্ড্র, গোপ, সদগোপ, চাঁই-মণ্ডল, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, কৈবর্ত প্রভৃতি জাতি সাহস ও বীরত্বে ভরপুর। আজ যুগের প্রয়োজন—এই সমস্ত জাতিকে ক্ষত্রিয়ের মর্যাদায় উন্নীত করা, ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া।

এটা খুবই প্রয়োজন। কারণ আজ আমাদের রাজা যারা, অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী, তারা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবধারায় পরিচালিত এবং ইসলাম ও খ্রিস্টানের সেবা করছে। তাই স্বাধীন হয়েও আজও আমাদের সমাজ অরক্ষিত। তাই আজও আমাদের মন্দির হয় ভগ্ন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা হয় আক্রান্ত, দেবমূর্তি হয় খণ্ডিত এবং নারীজাতির শীল ও সম্ভ্রম আজও বারবার হয় লুণ্ঠিত। আমাদের শাসকগোষ্ঠী এই অপমান, এই অত্যাচারের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবে না। তাই আজ ভারতের সেনাবাহিনী দেশের সীমান্ত রক্ষা করলেও সমাজরক্ষার জন্য চাই নতুন ক্ষত্রিয় সমাজ। সেই ক্ষত্রিয় সমাজ গড়ে উঠুক স্বামীজির স্বপ্নকে বাস্তব করে, দরিদ্রের ঝুপড়ি থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। আর বাকি সমাজ তাকে দিক ক্ষত্রিয়র মর্যাদা, ক্ষত্রিয়র স্বীকৃতি। এই হোক এ যুগের নতুন আদর্শ। এর জন্য প্রয়োজনে রচিত হোক নতুন সংহিতা। এই সংহিতা রচনার কাজে এগিয়ে আসুন সমাজের নবব্রাহ্মণেরা, যাদের পৈতে থাকুক বা না থাকুক, যাঁরা জ্ঞানে সমৃদ্ধ, বিশ্ব ইতিহাসে বিদগ্ধ, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ভালবাসায় গভীর এবং ধর্মপথগামী।

বৈশ্য

অতি সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষও জানে যে মাছের মাথা ও পেট আগে পচে। অনেক পরে পচন ধরে লেজে। সমাজের ক্ষেত্রে এটা একশ শতাংশ সত্যি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এরপর বৈশ্যদের নিয়ে আলোচনা করা খুবই প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বৈশ্যরা নিঃসন্দেহে সমাজ শরীরের উদর বা পেটের ভূমিকা পালন করে।

শরীরের যে কোন অংশে অসুখ হলে বা পচন ধরলে প্রথমে কিছুদিন সেই অসুখ শুধু সেই অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু তার চিকিৎসা না হলে সেই অসুখ বা পচন গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুরও কারণ হতে পারে। তাই পেটের অসুখ বা উদরের নাড়িভুঁড়ির পচন মোটেই অবহেলার বস্তু নয়। ঠিক সেইরকম আমাদের বৈশ্য গোষ্ঠী বা বণিক শ্রেণীর আচার আচরণ, চিন্তাভাবনা সঠিক দিশায় আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন সার্বিক সমাজের স্বার্থে।

শরীর খাদ্যগ্রহণ করে। মুখ দিয়ে আমরা খাই। তার পরেই সেই খাবার নেমে গিয়ে উদরে পাকস্থলীতে জমা হয়। সেখানে তার অবস্থানের সময়টা খানিকটা বেশি। তাই বলে অনেক বেশি নয়। গৃহীত খাদ্যবস্তু থেকে খাদ্যরস তৈরি হয়। সেই খাদ্যরস রক্তের মাধ্যমে শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্যরস তৈরি হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশটুকু শরীরের বর্জনীয় পদার্থ হিসাবে মলরূপে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একজন সাধারণ চেহারার মানুষ, পেটে যার ভুঁড়ি বা চর্বি অধিক নেই, দুপুরবেলায় খুব ঠেসে ভাত খেল। তার পেটটা বেশ টাইট হয়ে একটুখানি ফুলে গেল। তারপর সে যদি পরবতী ছয় ঘণ্টা আর কিছু না খায়, তাহলে তার পেটটা আর ততটা ফোলা থাকবে না। কোথায় গেল সেই খাবারগুলো? নিশ্চয়ই সেই পেটে নেই। থাকলে তো পেটটা ফোলাই থাকত। তাহলে দেখা যাচ্ছে শরীরের স্বাভাবিক নিয়মে পেটে খাদ্যের অবস্থান বেশীক্ষণ নয়। অল্পক্ষণের জন্য। পেটের কাজ—যতক্ষণ পাচনক্রিয়া সম্পূর্ণ না হচ্ছে, অর্থাৎ খাদ্যরসে পরিবর্তিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ খাদ্যকে ধরে রাখা। তারপর শরীরের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনের প্রক্রিয়ায় সেই খাদ্যরস শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে চলে যায়। ঠিক তেমনি সমাজ যে সম্পদ সৃষ্টি করে কৃষি, শিল্প ও বহুবিধ প্রক্রিয়ায়—সেই সম্পদ গিয়ে জমা হয় বণিককুলের বা ব্যবসায়ীর ঘরে। মানুষের পেট যেমন খাদ্যবস্তু তৈরি করে না, আহরণও করে না, সেই শুধুই খাদ্যবস্তুকে কিছুক্ষণের জন্য নিজের হেফাজতে জমা রাখে, ঠিক তেমনি সমাজে এই বণিককুল বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কোনরকম সম্পদ সৃষ্টি করে না। এই কথাটা আর একবার আন্ডারলাইন করে বলা দরকার। ব্যবসায়ীরা সমাজে কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না। সম্পদ সৃষ্টির জন্য তিনটি বস্তুর দরকার—শ্রম, বুদ্ধি ওসৃজনশীলতা (Creativity বা Creativeness) অবশ্যই লাগে। এছাড়া অবশ্যই লাগে কাঁচামাল অথবা কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ। জমি, জল, বৃক্ষ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি অনেক কিছুই এই প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকায় পড়ে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি কাঁচামালই প্রকৃতি থেকে আহরিত। এই প্রাকৃতিক সম্পদ বা কাঁচামালকে ব্যবহার করে মানুষ তাকে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বা সম্পদে রূপান্তরিত করে। এটাকেই আমরা আমাদের আলোচনায় সম্পদ নামে বারবার উল্লেখ করব।

এই সম্পদ সৃষ্টিতে মানুষের শ্রম, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি লাগে। এই তিনটি গুণই সব মানুষের মধ্যে থাকে না। সারা সমাজব্যাপী ছড়িয়ে আছে এই তিনটি গুণ। তাই সম্পদ সৃষ্টির পর তা ব্যবসায়ীর গোডাউনে গিয়ে জমা হল, আর ব্যবসায়ী ভাবলো সে-ই এর মালিক—এর থেকে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। গোটা সমাজ এই সম্পদ সৃষ্টি করেছে। গোটা সমাজই এর মালিক। ব্যবসায়ী সেই সম্পদকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য রক্ষা করার ভারপ্রাপ্ত। সহজ করে বোঝানোর জন্য দুটি উদাহরণ দেব। (এক) পাট, (দুই) জরীর কাজ করা কাপড়। পাট ফলিয়েছে চাষীরা। তাতে বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা খুব বেশি দরকার হয়নি বটে, কিন্তু পরিশ্রম হয়েছে প্রচণ্ড। পাট জমিতে প্রচুর জল লাগে। সেই জলে

কাদায় নেমে কাজ করতে হয়েছে, নিড়ানি দিয়ে ঘাস তুলতে হয়েছে। পাট কাটতে পরিশ্রম আছে। কাটার পর সেই পাটকে জলে ভিজিয়ে পচাতে হয়েছে। সেখানে পাট পঁচার দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। জল থেকে তুলে সেই পাট গাছের গা থেকে ছাড়াতে হয়েছে। ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে রোদে শুকোতে হয়েছে। শুকনোর পর সুন্দর করে বান্ডিল বাঁধতে হয়েছে। পাট চাষীর ঘরে শুধু চাষী নয়, তার বউ, ছেলে, মেয়ে—সবাই সেই কাজে হাত লাগিয়েছে। অনেকেরই হাতে পায়ে হাজা ধরে গেছে। এতখানি পরিশ্রমের পর চাষী সেই পাট নিয়ে মহাজনের কাছে বিক্রি করে এল। তার মানে কি ঐ পাটের উপর চাষীর মালিকানা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেল? আর ঐ মহাজন, সে-ই হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ মালিক? না এটা হতে পারে না। ঐ পাট শেষ পর্যন্ত যে ফিনিশড্ প্রোডাক্ট (উৎপাদিত দ্রব্য) হয়ে মানুষের ব্যবহারে লাগছে, সেই স্তর পর্যন্ত যে রোজগার বা লভ্যাংশ, তার অনেক বেশিরভাগটাই পাবে ঐ মহাজন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ের ব্যবসায়ীরা! তাদের বাড়ি উঠবে, গাড়ি হবে, সমস্ত বিলাসদ্রব্য তারা ভোগ করবে, আর সেই পাট উৎপাদনকারী চাষী—তার বাড়িতে কেরোসিনের লম্ফ জ্বলবে, তার ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে না গিয়ে এক হাঁটু পচা জলে দাঁড়িয়ে বাবাকে পাট ছাড়ানোর কাজে সাহায্য করবে—এটা চলতে পারে না।

(দুই) জরীর কাজ—বড়বাজারের ব্যবসায়ী জরী শিল্পীকে দিল প্লেন শাড়ি, জরী, সুতো, পুঁতি, চুমকি, রঙিন পাথর ইত্যাদি। কখনও কখনও নক্সা বা ডিজাইনও দিয়ে দেয়। সেই ডিজাইন ঐ ব্যবসায়ী তৈরি করেনি। কাগজের উপর এঁকে দিয়েছে কোন শিল্পী। সেই ডিজাইন অনুসারে অথবা নিজেরই তৈরি ডিজাইন দিয়ে জরী শিল্পীর ছেলে-মেয়েরা, পুরুষ ও স্ত্রীরা ঘাড় গুঁজে দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে একটি সুন্দর, ঝলমলে উচ্চ শিল্পকলাযুক্ত শাড়ি তৈরি করল। ব্যবসায়ীর ঘরে দিয়ে এল। এত পরিশ্রম করে সারা মাসে সে সাত-আট হাজার টাকা রোজগার করতে পারল। কঁচামাল লেগেছে হয়তো এক হাজার কি দু'হাজার টাকার। এই শাড়িটা বাজারে বিক্রি হবে ২০ হাজার টাকায়। ঐ জরী শিল্পীর সারা মাসের রোজগারকে শাড়ির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যাবে যে পাঁচশ টাকার বেশি ঐ শাড়ির মজুরী পায়নি। ঐ ব্যবসায়ী যদি ভাবে (আজকাল তা-ই ভাবে) যে ঐ শাড়ি বিক্রি করে যত লাভ পাওয়া যাবে সেই সবটারই সে একা মালিক, তাহলে সেই ভাবনা নিশ্চিত ভুল। ঐ শাড়ি ঐ ব্যবসায়ী তৈরি করেনি, ঐ শিল্প ঐ ব্যবসায়ী সৃষ্টি করেনি। সমাজ তা করেছে। তাই ঐ শাড়ির আসল মালিক সম্পূর্ণ সমাজ, ঐ ব্যবসায়ী একা নয়। সে কিছু সময়ের জন্য রক্ষক (Preserver) বা অছি (ট্রাস্টি) মাত্র। পেট যেমন কোন খাদ্যবস্তু নির্মাণ করে না, ঠিক তেমনি ব্যবসায়ীরাও সমাজে কোন সম্পদ সৃষ্টি করে না। করে গোটা সমাজ তার শ্রম, বুদ্ধি ও শিল্পপ্রতিভা (সৃজনশীলতা) দিয়ে।

মানুষের পেট যদি ভাবে আমার কাছে খাবার এসেছে, আমিই এর মালিক, আমিই এটা রেখে দেব, শরীরের অন্য কোন অংশে পাঠাবো না, তাহলে কী হবে? প্রথম ক'দিন পেট একটু ফুলতে পারে। তারপরেই শুধু হয়ে যাবে অজীর্ণ বা পেট খারাপ। পাতলা পায়খানা হয়ে বেরোতে থাকবে, আর হাত-পা গুলো শুকিয়ে যাবে। আরও কিছুদিন এই অবস্থা চললে মস্তিষ্কেও এর কুপ্রভাব পড়বে এবং বুদ্ধি ঠিকমতো কাজ করবে না। ফলে কী হবে? গোটা শরীরটাই অসুস্থ হয়ে পড়বে। মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে। শুরুটা কোথায় হয়েছিল? পেট থেকে। পেট খাদ্যবস্তুকে প্রক্রিয়া করে শরীরের বিভিন্ন অংশে না পাঠানোর ফলে এবার লোকটা যদি মারা যায়, তাহলে পেটটা কোথায় থাকবে? পেট যে স্বার্থপরের মত খাদ্যকে একা ভোগ করতে চেয়েছিল তা আর পারবে কি? না, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে পেটও খতম।

ঠিক তেমনি সমাজের দ্বারা নির্মিত বা সৃষ্ট সম্পদ যদি ব্যবসায়ীরা একা ভোগ করতে চায়, তার পরিণামও ঠিক ঐরকম হবে। মাছের পেট পচার মত এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেরা আগে অসুস্থ হবে, বিকৃতির শিকার হবে, তাদের পরিবার এবং তাদের সন্তানরা আগে নষ্ট হবে। আর সমাজের অন্যান্য অঙ্গও শুকিয়ে যেতে থাকবে। তাই বণিকসমাজকে খুব স্পষ্ট করে একথা বুঝতে হবে যে সমাজ দ্বারা

তৈরি সম্পদের তারা অল্প সময়ের জন্য অছি মাত্র, মালিক নয়। মালিক গোটা সমাজ, তাই ঐ সম্পদ থেকে যে লভ্যাংশ অর্জন হবে সেই লভ্যাংশকে গোটা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঐ লভ্যাংশ দ্বারা যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হবে, সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মালিক শুধু ঐ ব্যবসায়ীই নয়। গোটা সমাজেই সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ছড়িয়ে দিতে হবে, বিতরণ করতে হবে। বিতরণ মানে দান নয়, দয়া নয়, ন্যায্য distribution।

এখন কথা হচ্ছে, শরীর চলে প্রাকৃতিক নিয়মে। তাই পেট কোন বাঁদরামি ত্যাঁদরামি করতে পারে না। কিন্তু সমাজ তো প্রাকৃতিক নিয়মে চলে না, চলে মানুষের তৈরি নিয়মে। সুতরাং, সমাজ তৈরি করল সম্পদ, সম্পদ থেকে অর্জিত হল সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। সেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বণিকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় সমাজের সমস্ত অংশের মধ্যে বিতরণ করে দেবে — এ আশা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাদের সমাজ রচয়িতারা সে আশা করেনওনি। সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন দেশেই এরকম অবাস্তব আশা করা হয় না। সম্পদ দ্বারা অর্জিত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য (এবং জীবনে উন্নতির উপকরণ) সমাজের সমস্ত অঙ্গে সমবণ্টন করার দায়িত্ব থাকে প্রশাসনের বা শাসকের। সেই সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য, যাতে গোটা সমাজের উন্নতি হয়, বেশ কিছু নিয়মনীতি তৈরি করতে হয় ও সেগুলো পালন করতে হয়। এই নিয়মনীতিগুলি তৈরি করার দায়িত্ব বা অধিকার শাসকের বা রাজার ছিল না আমাদের দেশে। এই নিয়মনীতি সঠিকভাবে, নিরপেক্ষভাবে কে তৈরি করতে পারে? খুব সহজ করে বললে — যে নিজের কোলে ঝোল টানবে না। যে সমাজের সকলের কল্যাণকামী হবে। তার মানেই তাকে নিঃস্বার্থ হতে হবে। তারা কারা? ব্রাহ্মণরা? সম্ভবতঃ না। এই নীতি নিয়মগুলি তৈরি যাঁরা করতেন তাঁরা ঋষি নামে অভিহিত ছিলেন। এই ঋষি গৃহস্থও হতেন, সন্ন্যাসীও হতেন। ঋষি মানে কখনই শুধু সন্ন্যাসী নন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অনেক গৃহী বা সন্ন্যাসী আমাদের সমাজে ঋষি আখ্যা পেয়েছেন। ঋষি হতে গেলে ভগবৎ সাধনা করাটা বোধহয় খুব আবশ্যিক ছিল না। সত্যদ্রষ্টা, নিঃস্বার্থ ও সর্বজীবের কল্যাণকামী হওয়াটা আবশ্যিক ছিল। রাজর্ষি জনক চুটিয়ে রাজত্বও করতেন, সংসারও করতেন। ভগবৎ সাধনা কতটা করতেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু তিনি ঋষি ছিলেন। আধুনিক যুগে শ্রী অরবিন্দ খুবই বেশি রকমের ভগবৎ সাধনা করতেন। এমনকি সাধনার জন্য তিনি প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি ঋষি। কিন্তু বৃটিশের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের ভগবৎ সাধনার কথা কিছু জানা যায় না। ম্যাজেস্টারী করেছেন, আফিম সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং একাধিক স্ত্রী তাঁর জীবনে ছিল (একই সময়ে নাও হতে পারে)। সাহিত্যও প্রচুর রচনা করেছেন। কিন্তু আমরা নির্দ্বিধায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ঋষি বঙ্কিম নামে অভিহিত করি। ঋষিরা নিঃস্বার্থ বলে সত্যদর্শন করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর গৃহস্থ হয়েও সহজেই সত্যদর্শন করতেন। তাঁর মুখের বা লেখার এক একটি বাক্যে, এক একটি কথায় আমরা সেই অমোঘ সত্যকে অনুভব করতে পারি (উদাহরণ: — ”সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র”, ”তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন” ইত্যাদি।)।

এই নিঃস্বার্থ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সমাজের জন্য নীতি ও নিয়ম তৈরি করতেন। আর এই নিয়মগুলিকে যিনি সঙ্কলন ও সূত্রবদ্ধ করতেন, তাঁকে বলা হত স্মৃতিকার। উদাহরণ—মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। এই নীতি ও নিয়ম মেনে গোটা সমাজকে চলতে হত। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলকে। কিন্তু সবাই কি স্বেচ্ছায় এইসব নিয়মকানুন মেনে চলত? অবশ্যই না। তাদেরকে মানানোর জন্যই ছিল রাজদণ্ড। অর্থাৎ নীতি বা আইন প্রণয়ন করবেন ঋষিরা, আর তাকে লাগু করবেন রাজা বা রাজশাসন। এখানেই আসে শাসন ও শাসকের গুরুত্ব। শাসক বা রাজাকে কঠোরভাবে ঋষিদের দ্বারা নির্ধারিত নিয়মগুলিকে প্রজাদের দিয়ে পালন করাতে হবে। না করলে শাস্তি। শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাজার ছিল, রাজার থাকতে হবে।

তাই সমাজসৃষ্ট সম্পদের লভ্যাংশ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বণিকশ্রেণী একা আত্মসাৎ না করে, কঠোর

শাসনের দ্বারা তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজার উপর ছিল। আজ সেই দায়িত্ব সরকারের। এই নীতি অনুসারে স্পষ্টভাবেই সরকারের দুটো ভাগ থাকা উচিত। একটা ভাগ আইন তৈরি করবে, আর একটা ভাগ সেই আইনকে লাগু করবে। প্রথম যখন ভারতের সংবিধান তৈরি হয়, তখন সরকার সেটা তৈরি করেনি, পৃথকভাবে গঠিত একটি সংবিধান সভা সেই সংবিধান তৈরি করেছিল। তারা সরকার নয়। আজও সেই আইন যদি কোন রদবদল করতে হয়, বা নতুন আইন তৈরি করতে হয়, তা তৈরি করবে আইন সভা—যাকে আমরা সংসদ বা বিধানসভা বলি। এই দুই সভার সদস্যরা আইন তৈরি করবেন। কিন্তু লাগু করতে পারবেন না। আইন লাগু করার দায়িত্ব সংসদ বা বিধানসভার নয়। সেই দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসন কাকে বলে? ডি.এম., এস.পি, রেভিনিউ অফিসার, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, সেলস্ ট্যাক্স অফিসার, ফরেস্ট অফিসার, এল. আর. ও., ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশ পরিচালনকারীদের মধ্যে এই দুটি গোষ্ঠীর, আইন প্রণয়নকারী (এম.পি., এম.এল.এ.) ও প্রশাসনিক অফিসাররা উভয়েই যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে আইনভঙ্গকারীকে সাজা দেবে কে? এই সুযোগটাই নিয়েছে বণিক সমাজ। ফলে সমাজের শ্রম ও প্রতিভায় সৃষ্ট ধন, সম্পদ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ—এগুলির সমবন্টন দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বণিকশ্রেণী মনে করছে এতে তাদের একাধিকার। আর রাজনৈতিক দল, নেতা ও অফিসারদেরকে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তারা এই চরম অন্যায় কাজ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। এখানেই শেষ নয়। এই বণিকসমাজ সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের প্রতিনিধিকে ঢুকিয়ে দিয়ে, ভোটে জিতিয়ে এনে পুরো রাজনীতিটাকেই নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে। ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিড়লা, টাটা, মুন্দ্রা থেকে শুরু করে বর্তমানে মুকেশ আম্বানী পর্যন্ত এর স্পষ্ট উদাহরণ। তাদের, শুধুমাত্র তাদের স্বার্থ নজরে রেখেই দেশের আইন তৈরি হচ্ছে। বণিক সমাজের সম্পদের ভাণ্ডার আরও স্ফীত হচ্ছে। আর সমাজের অন্য অনেক অংশ শুকিয়ে যাচ্ছে, নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছে, উন্নতি ও উন্নয়নের সমস্ত ফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অর্থনীতির তথাকথিত উদারীকরণ সমাজের বিশাল শ্রমজীবি অংশের উপর নতুন করে পুঁজিবাদী শোষণ চাপিয়ে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এরকম বহু পরিস্থিতির, ঘটনার সাক্ষী। একটা খুব ছোট ও সহজ উদাহরণ দেব। আজ এই নতুন মুক্ত অর্থনীতিতে বহু বহু (বিশেষতঃ প্রাইভেট সেক্টরে) কর্মক্ষেত্রেই শ্রমিক বা কর্মচারীর কাজের সময় নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে ১২ ঘণ্টা। এটা কেন হবে? এটা কি অন্যায় নয়? এটা কি শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণ ও অত্যাচার নয়? নিজেকে ও পরিবারকে বঞ্চিত করে এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলটা কে ভোগ করছে? ঐ শ্রমিকটি কী? না, কখনোই নয়। তার যে মালিক, সে। এই সহজ নিয়মটা আরও সহজেই লঙ্ঘন করা হল যে, একটা মানুষের জীবনে একটা দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনভাগের একভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যয় হবে তার নিজের উপর। ঘুম, খাওয়া, স্নান, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি। আর এক ভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যবহৃত হবে জীবিকা উপার্জনের কর্মের জন্য। এবং আর একভাগ (৮ ঘণ্টা) ব্যবহার হবে সমূহের জন্য, নিজের ছাড়া বাকি সকলের জন্য এবং সবকিছুর জন্য। তার মধ্যে আসবে তার নিজের পরিবার, পাড়া, গ্রাম বা শহর, দেশ, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সব। এই তৃতীয় অংশটাকে ভীষণভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে, বহু মানুষের জীবন থেকে। তার ফলে ব্যক্তি সামাজিক কর্তব্য পালন তো দূরের কথা, পারিবারিক কর্তব্যও পালন করতে পারে না। আমার নিজের দেখা বহু ঘটনা যেখানে মা-বাবাকে সারাদিন ও অনেকটা রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয় সংসার চালানোর জন্য। বাড়ির ছেলে বখে যায় আর মেয়ে মুসলমানের পাল্লায় পড়ে লাভ জেহাদের শিকার হয়।

অর্থাৎ বণিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর অশুভ আঁতাতের ফলে সমাজের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিষ্পেষিত হচ্ছে ও শুকিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়—পরিবার ও সমাজের বাঁধুনিও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাই এই বণিকশ্রেণী বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। সেই নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব শাসকের, আর শাসককে সেই কাজে বাধ্য করার দায়িত্ব সর্বসাধারণ সমাজের।

এই কথাটাই অন্যভাবে বললে, সমাজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ্যপণ্য বণ্টনে একটা ন্যূনতম সমতা

রাখতে হবে। চূড়ান্ত বৈষম্য হবে সমাজের জন্য ঘাতক। এই চূড়ান্ত ও নগ্ন বৈষম্য থেকে তৈরি হবে বিরাট অসন্তোষ ও ক্ষোভ। তা ডেকে আনবে বিরাট বিস্ফোরণ, যা হবে ধ্বংসাত্মক। সম্পদের সঙ্গে সমতা না থাকলে তা হয় নোংরা সমৃদ্ধি। তা হয় বিশ্রী, শ্রী নয়। তাকে লক্ষ্মী বলে না। লক্ষ্মী হন সবসময় শ্রীযুক্ত। সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত সম্পদকেই শ্রী বলা হয় যার কথা গীতার শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে। এই সুষমা কথাটার মধ্যেই সমতা নিহিত আছে! তাই সমাজে শুধু সম্পদ বৃদ্ধি হলেই হবে না। তার বিতরণেও ন্যূনতম সমতা আনতে পারলে তবেই হবে সমাজ সুখী, নাহলে নয়।

প্রাচীনকালে বা অতীতে আমাদের দেশে এই বণিকশ্রেণী মোটেই নিন্দার পাত্র ছিল না। ভারতের শিল্পীদের সৃষ্ট অপূর্ব শিল্পকলা, ভারতের মেধা ও প্রতিভা প্রসূত লৌহশাস্ত্র, রসায়ন ও ভেষজ শাস্ত্রের উৎপাদিত অসাধারণ দ্রব্যগুলি গোটা পৃথিবীতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে বিপুল সম্পদ ভারতে এনেছিল ও বিদেশে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছিল। সেদিন এই কাজে বাংলা ছিল অগ্রগণ্য। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম বন্দরের ও সপ্তডিঙার সেইসব গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী যেন আমাদের Collective Memory-তে গাঁথা হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ের এই বাংলার কথা আমরা বেশ কিছুটা জানি। ঘরে ঘরে আকাল ছিল না, দারিদ্র্যের কষাঘাত ছিল না, উদয়াস্ত পরিশ্রমের অব্যক্ত যন্ত্রণা ছিল না। ঘরে ঘরে সুখশান্তি ছিল—হাসি ছিল, গান ছিল। পুণ্যিপুকুর থেকে পৌষল্যা, দোল-দুর্গোৎসব, ভাদু-টুসু-গাজন-সংক্রান্তি-নবান্ন থেকে বারুণী উৎসব অনুষ্ঠানে সারাবছর ভরে থাকত। বারো মাসে তেরো পার্বণ কথাটা তো সবাই জানে। প্রাচুর্য্য ছাড়া কি এত উৎসব করা যায়? মনের শান্তি ছাড়া কি এত উৎসব করা যায়? এই প্রাচুর্য্য কে তৈরি করেছিল? পুরো সমাজই তা তৈরি করেছিল। মনুষ্য শরীরের উদরে তৈরি হওয়া খাদ্যরসের মত সেই প্রাচুর্য গোটা সমাজশরীরে ছড়িয়ে পড়ত। শুধু বণিকশ্রেণী একা তা ভোগ করত না। সেই ছড়িয়ে পড়াকে সুনিশ্চিত করত রাজার শাসন। শাসন চালানোর জন্য নীতি বা আইন তৈরি করে দিতেন ঋষিরা।

আজ পয়সার প্রভাবে বণিকশ্রেণী, যারা উৎপাদন করতে পারে না, সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে না, তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে শাসকশ্রেণীকে। দুর্নীতিপরায়ণ শাসকশ্রেণী এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই রাজতন্ত্রের অবসান হলেও নতুন করে পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ আমাদের সমাজের ওপর চেপে বসেছে। বহু মানুষ এখন ১২ ঘণ্টা কাজের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তার হয়ে কথা বলার কেউ নেই। তাকে এই নিষ্পেষণের হাত থেকে বাঁচানোর কেউ নেই। এর শেষ পরিণাম ভাল হতে পারে না। এর শেষ পরিণাম—রাষ্ট্রবিপ্লব অথবা সমাজের মৃত্যু। আর ওই রাষ্ট্রবিপ্লবকে রোখার জন্য বণিকশ্রেণী তার নিজ স্বর্থরক্ষার কাজে লাগায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আইন, আদালত ও প্রশাসনকে।

আর একটা কথা না বললেই নয়। দেশের মধ্যে শাসন চালানো বা আইন লাগু করার দায়িত্ব যেমন সরকার বা শাসকের উপরে থাকে, ঠিক তেমনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষণ করার দায়িত্বও শাসকেরই কাজ, তার কাজের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। এই কাজে ব্যর্থ হলে দেশবাসীর নির্মিত বা লব্ধ সম্পদ মুহূর্তে তছনছ হয়ে যাবে, লুণ্ঠিত হয়ে যাবে। এছাড়া আমরা দাসে পরিণত তো হবই। তাই এই দেশরক্ষার কাজ সম্পদ সৃষ্টির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোন ঢিলেমি, কোন সমঝোতা চলে না। আর এই কাজে শক্তি দরকার (সামরিক শক্তি)। আর এই শক্তিকে পরিচালনা যারা করবে তাদেরকে সাহসী হতে হবে। তাই অতীতে শুধু ক্ষত্রিয়রাই আমাদের শাসক বা রাজা হতেন। তর্কের কচকচিতে না গিয়েও সকলেই জানেন যে, ব্যবসায়ীকুলের অন্য অনেক গুণ থাকলেও তাঁরা বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করার মত সাহসী নন। তাঁদের সাহসী না হওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ ব্যবসা হয় শান্তির সময়ে। অভিজ্ঞতায় খুব স্পষ্টভাবেই বারবার দেখা গিয়েছে যে, ব্যবসায়ীরা যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে চান—আপোষ করেও, সমঝোতা করেও। ক্ষত্রিয়রা মোচ (গোঁফ)-এর জন্য লড়ে। অর্থাৎ সম্মানের জন্য লড়ে, ব্যবসায়ীরা কখনই নয়। গুন্ডা ছুরি বা বন্দুক নিয়ে গেলেই ব্যবসায়ী গোপনে তার সঙ্গে সমঝোতা করে নেয়। এদের হাতে যদি দেশরক্ষার ভার পড়ে, তাহলে দেশের কী

অবস্থা হবে? যারা দাউদ ইব্রাহিম, ছোটা শাকিল, সেলিম বা সোহরাব (বড়বাজার)-এর মত গুণ্ডার সঙ্গে মোকাবিলা করার সাহস রাখে না, তারা চীন, পাকিস্তান, আমেরিকা, রাশিয়ার মত আন্তর্জাতিক গুণ্ডাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের কোমর ভাঙার সময় ভারতকে চোখ রাঙাতে আমেরিকা তার বিখ্যাত সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীকে দাবাতে পারেনি। এখানে ইন্দিরা গান্ধীর সাহস বা ক্ষত্রতেজ প্রকাশিত হয়েছিল। কোন ব্যবসায়ী এই সাহসের পরিচয় দিতে পারতো না। সমঝোতা করে নিত। নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও সত্য লঙ্ঘন করে গান্ধীজী যে দেশবিভাগকে মেনে নিলেন ও কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবন ভেঙে তছনছ করে দিলেন—কেন? কারণ, জিন্না, সুরাবর্দী-নিজামের গুণ্ডামির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন না ও মোকাবিলা করতে পারলেন না বলে। এই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও আপোষকামিতার পিছনে তাঁর বেনিয়া রক্ত কতটা কাজ করেছে তা জানি না, কিন্তু তাঁর উপর ঘনশ্যাম দাস বিড়লার প্রভাব যে কাজ করেনি, তা জোর দিয়ে বলা যায় কি? সবাই জানে বিড়লার কোষাগার গান্ধীর জন্য খোলা ছিল। তাই তাঁর প্রভাব এড়ানো গান্ধীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ করি, যে গান্ধী একসময় দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে গিয়েছিলেন (যদিও বৃটিশের সেবা করতে) সেই গান্ধী জিন্না-নিজাম-সুরাবর্দীর রক্তমাখা ছুরির সামনে নির্বীর্য হয়ে গেলেন, এটা অনেকটাই বিড়লার প্রভাবে।

এই উদাহরণটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল শাসককে সাহসী হতে হবে, ক্ষাত্রবীর্যসম্পন্ন হতে হবে, যা বেনিয়াগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই দেশরক্ষা ও দেশ চালানো—এই দুটা কাজই ক্ষাত্রবৃত্তি বা ক্ষত্রিয় প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের কাজ, বেনিয়া মানসিকতার, সমঝোতাকামী মানসিকতার লোকের কাজ নয়। বেনিয়াকুলের প্রকৃত অবস্থান, দায়িত্ব, ভূমিকা, দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে এই সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শাসন চালনায় তাদের অনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণে তাদের অধিকার সীমিত করতে হবে ও সমাজসৃষ্ট সম্পদের ফল গোটা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে এই কাজ অত্যন্ত দরকারী।

শূদ্র

এইবার লেখার সব থেকে কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিয়ে লেখার পর শূদ্র নিয়ে লিখতে হবে। না লিখতে হলেই সব থেকে ভালো হত। কারণ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় এটা। কিন্তু না লিখলে বৃত্তটাও সম্পূর্ণ হয় না, আর পলায়নী মনোভাবের পরিচয় ফুটে ওঠে। তাই সাহস করে লেখার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই সমস্যা যেটা তা হল, শূদ্র নিয়ে লিখতে হলে শূদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। আর, শূদ্রের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, সমাজে প্রচলিত ধারণা—শূদ্র মানেই পিছে, বাকি তিন বর্ণের নিচে। তাই শূদ্র নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই আমার মতামত, ধারণা, ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, পাঠকরা একথা ভেবে নিতে পারেন যে, আমি সমাজে শূদ্রের অবস্থানকে মেনে নিয়েছি বা গ্রহণ করেছি। তাই এই লেখায় রিস্ক। অতএব আত্মরক্ষার একটা প্রচেষ্টা করতেই হয়। আমার আত্মরক্ষার বর্মটা হল এই : সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা ও শ্রেণীবিন্যাস আমি যতটা অনুধাবন করতে পেরেছি তাতে আমার জন্মগত বা পরিবারগত স্থান শূদ্র বর্ণে, আদৌ যদি কোন বর্ণসমাজে এখনও থেকে থাকে।

আমি অনেকবার অনেক লেখায় বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমাদের দেশে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে জাত আর বর্ণ জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। জাত প্রায়শই বৃত্তিভিত্তিক। ছুতার, কামার, সদগোপ, তাঁতি, তেলি, তিলি প্রভৃতি জাতকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যেসব ক্ষেত্রে বৃত্তি ও জাত অঙ্গাঙ্গী নয়, সেসব ক্ষেত্রেও জাত স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। যেমন, মাহিষ্য, কায়স্থ, বাগদী, নমঃশূদ্র, আগুড়ি ইত্যাদি। হিন্দি বলয়েও ভূমিহার, কুর্মি, যাদব, খটিক, বাল্মীকি প্রভৃতি জাতি পরিচয় প্রত্যেক হিন্দুর জন্যই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু অনেকেরই বর্ণের পরিচয় বড়ই গোলমেলে। এইসব গোলমালের মধ্যেও যেটুকু ধারণা নিয়ে আমাদের সমাজটা চলছে, সেই ধারণা অনুসারে কায়স্থরা শূদ্র বর্ণের মধ্যে পড়ে। চাঁদের মধ্যেও যেমন কালো দাগ আছে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুগামী হয়েও স্বামীজীর জীবনে এই একটি মাত্র কালো দাগ আমি দেখতে পেয়েছি। তা হল, স্বামীজী আমেরিকায় বসে প্রায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজের শূদ্র পরিচয় অস্বীকার করেছেন ও নিজেকে (কায়স্থ বলে) ক্ষত্রিয় পরিচয় দিয়েছেন এক অতি অতি দুঃসহ অবস্থায় পড়ে। সে ঘটনার বর্ণনায় যাচ্ছি না। আগ্রহী পাঠক পড়ে নেবেন। কিন্তু স্বামীজীর এই নিজেকে ক্ষত্রিয় বলা ও শূদ্র পরিচয় অস্বীকার করা—এটাকেই আমার কাছে স্বামীজীর উজ্জ্বল জীবনে একমাত্র কালো দাগ বলে মনে হয়েছে। আবার স্বামীজীর কথাতেই 'লোকাচার, দেশাচার খুবই শক্তিশালী'। তাই তিনি বললেও কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণ—এটা সমাজে সর্বজনস্বীকৃত নয়। কায়স্থর মত বদ্যিদেরও বেশ একটু উন্নত জাত বলে মনে করা হয়। কিন্তু আমাদের বাংলার ধর্মজগতে খুবই শ্রদ্ধেয় একজন ধর্মগুরু ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথকে আমি দেখেছি, তিনি তাঁর কায়স্থ, বদ্যিসহ সকল অব্রাহ্মণ শিষ্যকে (তাদেরকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন) দিয়ে সঙ্কল্প করাতেন যে মা-বাবার মৃত্যুতে ৩০ দিনের অশৌচ পালন করবে এবং নিজ সন্তানদের অসবর্ণে বিবাহ দেবে না। পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ভদ্রতাবশতঃ মুখে বলেন না যে অব্রাহ্মণরা সকলেই শূদ্র (সারা দেশে নয়, আমাদের এই বাংলায়)। কিন্তু তাঁরা যেসব বিধিনিয়ম পালন করেন ও যজমানদের দিয়ে করান, তা সামান্য খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। আমি নিজে গভীর বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্মকর্মে সঙ্কল্পের সময় পুরোহিতরা সমস্ত অব্রাহ্মণ যজমানদের তাদের উপাধি যা-ই হোক না কেন, নামের সঙ্গে ও তাদের পিতামাতার নামের সঙ্গে দাস ও দাসী শব্দ ব্যবহার করান এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে দেবশর্মা ও দেবী শব্দ ব্যবহার করান। এটা আমার কাছে খুবই আপত্তিজনক এবং অপমানজনক মনে হয়েছে। অব্রাহ্মণ ও শূদ্ররা দাস হলে কার দাস? যদি বলেন ভগবানের দাস, তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা বা অন্য বর্ণরা, তাঁরা ভগবানের দাস হবে না কেন? তাহলে তো এই সত্যটাই বেরিয়ে আসছে যে আমাদের প্রচলিত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে শূদ্রদেরকে অন্য তিন বর্ণের দাস বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সুতরাং যুক্তি, ব্যাখ্যা, শাস্ত্রের বাছাই করা শ্লোক দিয়ে যতই

প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন যে, সমাজের প্রত্যেক জাতির জন্য কর্ম বা বৃত্তি নির্দিষ্ট করা আছে এবং প্রত্যেক কর্ম এবং প্রত্যেক বৃত্তিই সমান গুরুত্বপূর্ণ, তা দিয়েও এই তিক্ত দাস ও প্রভুর (দাস থাকলেই প্রভু থাকবে) ধারণাকে চাপা দেওয়া যাবে না। সুতরাং সত্যটাকে স্বীকার করে নিয়ে বর্তমানে সেটাকে অচল ঘোষণা করাই ঠিক নয় কি?

এই সত্যকে স্পষ্ট অনুভব করে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তার সংশোধন করতে চেয়েছিলেন বলেই কর্মবীর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে শূদ্রের জন্য নিষিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র সর্বজনে ব্যাপক প্রচার করেছিলেন যা আজও গোটা উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এর মধ্য দিয়ে সত্যকে স্বীকার করার সৎ প্রয়াস দেখা যায়।

শাস্ত্রে আছে—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ

সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্চতে।

বেদপাঠী ভবেৎ বিপ্রঃ

ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।

(আত্রেয় স্মৃতি, ১৪১-১৪২ শ্লোক)

অর্থ: —শূদ্ররূপেই সবাই জন্মগ্রহণ করে, বিধিবদ্ধ সংস্কারের দ্বারা হয় দ্বিজ (তিন বর্ণ যারা উপবীত ধারণ করে), বেদপাঠী হলে হয় বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানলে তবেই হয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং শূদ্র জন্ম কোন খারাপ ব্যাপার নয় বা অপমানের নয়।

আবার শাস্ত্রে একটা বহুচর্চিত শ্লোক আছে যাতে বলা হয়েছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উদর থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি। সুতরাং ব্রাহ্মণ সব থেকে উঁচুতে, শূদ্র সব থেকে নিচে, আর মাঝখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এইভাবে দেখলে শূদ্রকে ছোট করা হয়। সুতরাং সেই ভাবনা বা ধারণা কাটানোর জন্য বহু চেষ্টা, বহু ব্যাখ্যা করা হয়। পা না থাকলে শরীর চলতে পারে না। তাই শূদ্রই সমাজকে চালাচ্ছে। আমরা গুরুজনদের বা দেবমূর্তিকে যখন প্রণাম করি তখন তার মাথায় করি না, পায়ে প্রণাম করি। সুতরাং পা মাথার থেকেও বেশি সম্মানের, ইত্যাদি বহু রকমের ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যায় ডাল গলে না। সমাজেও ধারণার পরিবর্তন হয় না। উঁচু-নিচু ভাব, ভেদাভেদ কাটে না। তাই উত্তর ভারতে যখন সমাজের একটা বিশাল অংশকে দলিত বলে চিহ্নিত করা হয় তখন কেউ জোর গলায় বলতে পারবেন না যে এই 'দলিত' নামটা অনুচিত ও অপ্রাসঙ্গিক, এরা সামাজিক দলন, নিপীড়ন, বৈষম্য-লাঞ্ছনার শিকার হয়নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যতই তুমি পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর না কেন, সমাজের সেই পূজ্য 'পা' সমাজের লাথিই খেয়েছে। তাই তো তারা আজ দলিত নামে পরিচিত বা স্বীকৃত। আজ তারা যখন নিজেদেরকে জোটবদ্ধ করে মাথায় 'বহেনজী'কে (মায়াবতী) বসিয়েছে, তখন তা সকলেরই মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের নামে এখন আমরা অভিযোগ করছি যে ওরা জাতপাতের রাজনীতি করছে। অভিযোগটা কি ঠিক? আমার মতে, না। জাত থাকবে, একটা জাত চিরকাল পিছনে পড়ে থাকবে, নিপীড়িত, পদদলিত হবে, শাস্ত্রে ও মন্ত্রে দাস বলে উল্লেখিত হবে, এসবে দোষ নেই; আর তারা একজোট হয়ে মানুষের মত, অন্যদের সমান সম্মান পেতে চাইবে—তাতেই দোষ? রাজনৈতিক স্বার্থে চাকরি, শিক্ষা ও বহু ক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমাজে স্বার্থের হানাহানি শুরু করেছে। উচ্চবর্ণকে (তিন বর্ণ) দলিতদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় খুব ভালো করে জানি, গভীরভাবে জানি যে, এই বিশাল দলিত সমাজের আসল চাহিদা, ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা সংরক্ষণ নয়, চাকরি নয়। তাদের চাহিদা শুধু আর

শুধুই মনুষ্যত্বের সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা। শহরের চাকরি ও কেরিয়ারসর্বস্ব শিক্ষিত মানুষের এটা বুঝতে অসুবিধা হবে। কিন্তু সত্য সেটাই। মনে করুন দশ হাজার জনসংখ্যার একটি হরিজন বসতিতে একটিমাত্র ছেলে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। সেখানে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরির জন্য আশা করতে পারে ঐ একটিমাত্র ছেলে ও তার পরিবার। সংরক্ষণ থাকলে তার একটু সুবিধা হয়। কিন্তু বাকি ন'হাজার ন'শ নিরানব্বই জন দলিত মানুষের তো তাতে কোন লাভ নেই! তাহলে তারা এত ক্ষুব্ধ কেন? কীসের টানে তারা ছুটে যাচ্ছে আম্বেদকর, রামস্বামী নাইকার, বহেন মায়াবতী, উদিতরাজ, রামবিলাস পাসোয়ানদের দিকে? চাকরির আশায় নয়। মনুষ্যত্বের সম্মানটুকু পাওয়ার আশায়।

একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। বিহারের গোপালগঞ্জ জেলার একটি গ্রামে গেছি। সেখানে বাল্মীকি বা রবিদাস সম্প্রদায়ের জাতির অনেক মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি। বয়স্কদের সঙ্গে এবং তরতাজা যুবকদের সঙ্গেও। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, তাদের চাহিদা চাকরি নয়, জমি নয়, চাহিদা শুধু গ্রামে ভূমিহারদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে প্রবেশাধিকারের। নিজেকে সামলাতে পারিনি। এরা মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইছে। সমাজ ঢুকতে দিচ্ছে না। এরপর এরা যখন বিধর্মী হয়ে যাবে, ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন এই হিন্দুসমাজই ত্রাহি ত্রাহি রব তুলবে। আমি ঐ ভূমিহারদের সঙ্গে তর্ক করেছি—এদেরকে মন্দিরে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? তারা বাজে অজুহাত দিয়েছে—এরা নোংরা থাকে, এরা মৃত পশুর চামড়া ছাড়ায়, তাই এদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাহলে মৃত পশুর চামড়া কে ছাড়াবে? আসলে এসব অজুহাত। উত্তরপ্রদেশের ঠাকুরদের (ক্ষত্রিয়) মধ্যে যান। দেখবেন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় জননেত্রী মায়াবতীকে সবসময় চরম ঘৃণাভরে 'চামরাইন' বলে উল্লেখ করে। মানে 'চামারনী'। সুতরাং তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেও অসবর্ণের কাছে তাঁর চামার পরিচয়টাই মুখ্য এবং ঘৃণ্য।

সুতরাং শূদ্র বা দলিতদের প্রতি সমাজের বাকি অংশের মনোভাব পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে আসল দরকারী কাজ। অন্য ব্যাখ্যা, যুক্তিতে কাজ হবে না। এই মনোভাব পরিবর্তন যদি আমরা না করতে পারি, তাহলে আমাদের বিপদ কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অবস্থা তার স্পষ্ট প্রমাণ। পূর্ববঙ্গেও হিন্দুদের এই দুরবস্থার পিছনে অনিবার্য কারণ জাতপাতের বিভেদ ও নমঃশূদ্রদের প্রতি ঘৃণার ভাব।

ভাবলে বুক ফেটে যায় যে, যারা নিজেদের উপাধি 'রাম' নিয়েছে, তারাই রামের মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। রামের স্রষ্টা 'বাল্মীকি'র নামে যারা নিজেদের উপাধি নিয়েছে তাদেরও ঐ একই অবস্থা। আমাদের এই পাপের মূল্য কি দিতে হবে না? একটু ভেবে দেখুন তো আমাদের সমাজের এইসব অংশগুলিকে, যাদেরকে মনুষ্যত্বের সম্মান দেওয়া হয়নি, মন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি, এক পুকুরে (আম্বেদকর-চৌদার তালাও) বা এক কলে জল খেতে দেওয়া হয়নি, তারা যে আজও বিধর্মী হয়ে যায়নি, তার জন্য কতটুকু কৃতিত্ব আমাদের সমাজের উচ্চবর্ণ দাবী করতে পারে? আমার ধারণা—একটুও না। তাদেরকে আমাদের ধর্মে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাদের সমাজ কী করেছে? কিছুই না। তারা যে আজও হিন্দুসমাজের মধ্যে সংযুক্ত আছে তার সবটুকু কৃতিত্ব/শ্রেয় তাদেরই প্রাপ্য, আর কারও নয়।

এখনও সাবধান হওয়ার সময় আছে। ভারতে ইসলাম ধনে, জনে ও প্রতিপত্তিতে যেরকম বাড়ছে তাতে এই সময় আর বেশিদিন থাকবে না। তার আগেই আমাদেরকে সুনিশ্চিত ও ফলদায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—আমেরিকার মত। সেখানে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য ছোটবেলা থেকেই প্রতি স্কুলে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া হয়, যাতে ছোট থেকেই তারা সাদা ও কালোর মধ্যে ভেদ না করার শিক্ষা পায়। সে কাজটা কিন্তু অনেক কঠিন আমাদের থেকে। কারণ সাদা ও কালোদের মধ্যে চেহারায় বৈসাদৃশ্য প্রকট। সে তুলনায় আমাদের কাজটা অনেক সহজ। শুধু মন থেকে এটা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের প্রতিটি স্কুলে প্রথম থেকেই শিক্ষা দিতে হবে যে জন্মের দ্বারা মানুষের স্তর নির্ধারণ হয় না, কর্মের দ্বারা হয়। কোন বিশেষ পরিবারে বা বিশেষ গোষ্ঠীতে জন্মের জন্য কেউ ছোট নয়, কেউ

বড় নয়, সকলেই সমান। কর্মের দ্বারা, যোগ্যতার দ্বারা, আচরণের দ্বারা, ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যেককে বড় হতে হবে। শুরু থেকেই শিশুদের মনে ছোটজাত, ছোটলোক ইত্যাদি কথাগুলো যেন একেবারেই স্থান না পায়। চামরাইন, চাঁড়াল, ক্যাওড়া ইত্যাদি কোনরকম জাতিসূচক গালাগালি বা অবজ্ঞা ভাব যেন ছোটদের মনে বাসা বাঁধতে না পারে, তার জন্য শক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। এই সমস্ত পদক্ষেপ ও ব্যবস্থার অন্তিম ফল হবে—শূদ্র, দলিত, হরিজন প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি এবং একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজযুক্ত সুসংহত হিন্দুসমাজ।

রামের শক্তিপথ

আমার আমেরিকার বন্ধু দিলীপভাই মেহেতো। টেক্সাস রাজ্যের হিউস্টন শহরে বাড়ি। দিলীপজীর বয়স ৭০ পার করলেও বড় গাড়ি চালান ২৫ বছরের যুবকের মতো। তিনি সাহসী ও সক্রিয়। তাঁর সঙ্গে আমি বহু সময় কাটিয়েছি। তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার অনেকটাই জানতে পেরেছি। তিনি একজন আমার মতই কট্টর হিন্দু, কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু নন। আমাদের চিন্তা-ভাবনা এইরকম—মন্দিরের পূজারী ও ভক্ত উভয়কেই নিষ্ঠাবান হতে হবে। কিন্তু মন্দিরের দারোয়ান বা প্রহরীকে সজাগ, সাহসী ও তৎপর হতে হবে। তার জন্য শুধু নিষ্ঠাটাই যথেষ্ট নয়। আমরা নিজেদের জন্য হিন্দুধর্ম, হিন্দু সমাজমন্দির ও হিন্দু রাষ্ট্রমন্দিরের সজাগ প্রহরী বা দারোয়ানের ভূমিকা বেছে নিয়েছি। দিলীপজী সুদূর আমেরিকাতে বসে ভারতের জন্য দিবারাত্র যেভাবে কাজ করছেন তা থেকে আমার মনোবল অনেকটাই বেড়েছে।

হিউস্টন শহরে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৫টি মন্দির আছে। স্বামীনারায়ণ, দুর্গাবাড়ি, আর্যসমাজ প্রভৃতি। এর সবগুলিতেই তিনি যাতায়াত করেন, কোঅর্ডিনেশন করেন ও সকলকে ভারতের জন্য ও ভারতের হিন্দুদের জন্য কিছু করতে অনুপ্রাণিত করেন। ভারত থেকে প্রায় সমস্ত ধর্মগুরুরা আমেরিকা সফরে যান। আমেরিকার হিন্দুদের এই ধর্মগুরুদের প্রতি ভক্তি কম নেই। তাঁরা ওই গুরুদেরকে দু'হাতে টাকা ঢেলে দেন। কিন্তু এই গুরুরা ভারতের হিন্দুসমাজকে রক্ষার কাজ ও হিন্দুধর্মের অপমানের প্রতিকারের জন্য কিছুই করেন না। তা দেখে দিলীপজী মনে ব্যথা পান ও হায় হায় করেন। ভারতে হিন্দুদের অধঃপতনের জন্য তিনি খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত। হিন্দুদের কাপুরুষতা ও দুর্বলতা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। দিলীপজী তখন নতুন আমেরিকায় গেছেন। একদিন একটি ব্যাঙ্কে গেছেন। ব্যাঙ্কের ভিতরে চেয়ারে বসে আছেন। তিনি দেখলেন, একজন স্বাস্থ্যবান কালো চামড়ার লোক ব্যাঙ্কের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দরজাটা খুলে। ব্যাঙ্কের একজন মহিলা সিকিউরিটি স্টাফ ওই লোকটিকে গিয়ে বলল, দরজা ছেড়ে ভিতরে আসতে, কারণ ব্যাঙ্কে এ.সি. চলছে। তাই দরজা খোলা রাখা যাবে না। লোকটি পাত্তা দিল না। মহিলাটি দ্বিতীয়বার গিয়ে একই কথা বলল। কিন্তু লোকটি শুনল না। একইভাবে কাঁচের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল। ওই মহিলা তারপর ওই লোকটির কাছে গেল। এবং কোন কথা না বলে হাতের কনুই দিয়ে সজোরে তাকে ধাক্কা মারল। অপ্রত্যাশিত এই ধাক্কা খেয়ে লোকটি ব্যাঙ্কের বাইরে ছিটকে পড়ল। এই দৃশ্য দেখে দিলীপজীর মনে হল— "আমরা এতদিন মা দুর্গার কথা শুনেছি। কিন্তু এ যেন স্বচক্ষে মা দুর্গাকে দেখলাম, যা ভারতে কোনদিন দেখিনি।" প্রায় ৪০ বছর আগে দেখা সেই দৃশ্য আজও দিলীপজীর স্মরণে আছে। দিলীপজীর মনে হয়—আমরা হিন্দুরা শুধু ধর্মের কথা বলি, কিন্তু ধর্মের শিক্ষা নিই না, ধর্ম আচরণ করিনা। আর আমেরিকানরা ধর্ম আচরণ করে এবং তা আমাদের হিন্দু ধর্ম। আমেরিকার লোকেরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। যীশুখ্রিস্টকে যারা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, যীশু তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যীশুর অনুগামীরা ক্ষমা করে না। যে তাদের ক্ষতি করে, তাকে তারা শাস্তি দেয়।

আমেরিকার ওই মহিলা সিকিউরিটি গার্ডের আচরণ থেকে কয়েকটি জিনিস নজরে আসে। (১) তারা অন্যায়কে মেনে নেয় না, (২) তারা Passive বা নিষ্ক্রিয় নয়, (৩) অন্যায়কারীকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করে না, (৪) অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য শক্তিপ্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না। এই চারটি থেকে যে সূত্রটি বেরিয়ে আসে তা হল এই— শক্তি দ্বারাই অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে। এই চিন্তাধারাকে যদি একটা মতবাদ বলা যায়, তাহলে তার নাম হবে "শক্তিবাদ"। এর ইংরাজি অনুবাদ করা কঠিন। কারণ 'শক্তি'-র অনেকগুলি ইংরাজি প্রতিশব্দ আছে— Strength, Power, Energy, Force ইত্যাদি। মতবাদকে বলা হয় "ism"। শক্তিবাদ-এর অনুবাদে এই চারটি শব্দের কোনটার সঙ্গে ism যোগ করা যাবে? সিদ্ধান্ত করা কঠিন। কিন্তু শব্দ যাই হোক না কেন, এই চিন্তাধারা বা এই মতবাদ অনুসারে

কর্তব্যটা কী—তা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই।

বুঝতে তো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই চিন্তাধারা বা মতবাদকে স্বীকার করতে ও গ্রহণ করতে অসুবিধা আছে। কারণ, প্রথমতঃ এই পথে হিংসা আছে। দ্বিতীয়তঃ আমরা গত ৫০০ বছর ধরে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অন্য একটা পথের কথা জেনেছি ও শিখেছি। তার জন্য আমরা গর্ব অনুভবও করি। আধুনিক ভাষায় তার নাম Passive resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এরই একটু প্রসারিত বা প্রশস্ত সংস্করণ হল গণআন্দোলন। চৈতন্য ভক্তরা দাবী করেন—এটা চৈতন্যদেবের আবিষ্কার। চাঁদ কাজীর অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রকে প্রয়োগ করেছিলেন চৈতন্যদেব। বিশ্বে সেটাই ছিল এই অস্ত্রের প্রথম প্রয়োগ। এই কৃতিত্ব যদি চৈতন্যদেবকে দিতেও হয়, আপত্তি নেই। কিন্তু দু'টি কথা, দু'টি সত্য আমাদের নজরের বাইরে গেলে চলবে না। (১) আমাদের শাস্ত্র বা কোনো পুরাণে এইরকম কোন উদাহরণ নেই। রামায়ণ, মহাভারতেও নেই। সুতরাং এই পদ্ধতি আমাদের শাস্ত্রসম্মত—এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। (২) এই পদ্ধতির প্রয়োগে চৈতন্যদেবের দল বেড়েছে, কিন্তু যে সমাজে এই দল এবং যে সমাজকে বাঁচানোর জন্য তিনি এই পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছিলেন, সেই সমাজ অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গে ও মণিপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব বেশি ছিল। এই দুটি স্থানেই সার্বিকভাবে হিন্দুসমাজ পরাজিত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ মুসলমানের অধীন হয়েছে ও মণিপুরে খ্রিস্টানের সংখ্যা ও শতাংশ অনেক বেড়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় ৪৫০ বছর পর হল আমাদের দেশে গান্ধীবাবার আবির্ভাব। ইনি ছিলেন রামভক্ত। রামনাম মুখে না নিয়ে কোন কাজ করতেন না। কিন্তু রাম কোনদিন অন্যায়কারীর সামনে ধর্না দেননি, অসহযোগ আন্দোলন করেননি, সত্যাগ্রহ করেননি, আবেদন-নিবেদন করেননি। বালক বয়সে রাম তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে যা করেছিলেন, তার নাম কি গান্ধীবাদ? সেতু বাঁধতে সমুদ্র যখন রাস্তা দিচ্ছিল না, তখন রাম কি তার সামনে সত্যাগ্রহে বসেছিলেন? বালীকে বধ কোন উপায়ে করেছিলেন? রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের কাছে লক্ষ্মণকে কি ধর্না দিতে পাঠিয়েছিলেন? কুম্ভকর্ণ ও রাবণের মন জয় করার জন্য এবং রাবণকে পাপের বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য রামচন্দ্র তাদের সামনে সত্যাগ্রহে বসেছিলেন কি? ব্রিটিশকে তাড়ানোর জন্য গান্ধীজী তার আন্দোলনের পক্ষে এই যুক্তিই দিতেন যে ভারতের উপর শাসন চালিয়ে ব্রিটিশের বড় পাপ হয়ে যাচ্ছে। তাতে ব্রিটিশ জনগণের খুব অকল্যাণ হচ্ছে। তাই তাদের কল্যাণ করতেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন করছেন। রামচন্দ্রও রাবণকে পাপমুক্ত করেছিলেন। তবে তাকে খতম করে, ধরিত্রী মাতাকে ভারমুক্ত করে। রামভক্ত গান্ধী ব্রিটিশকে পাপমুক্ত করতে গিয়ে তার সমস্ত পাপের বোঝাটা ভারতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। আর সেই পাপে ভারত দ্বিখণ্ডিত হল। পাঁচ কোটি মানুষ গৃহহীন রিফিউজি হল। পাঁচ লক্ষ হিন্দুনারীর সতীত্ব নষ্ট হল। দশ লক্ষ হিন্দু নিহত হল। এবং সেই দেশভাগের ক্ষত আজও দগদগে। কাশ্মীর, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে সেই ঘায়ের রক্ত ও পুঁজ আজও বেরোচ্ছে এবং তা গোটা ভারতকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে।

এই বিশ্লেষণ অনুসারে সহজেই বোঝা যায় যে গান্ধীবাবা রামভক্ত ছিলেন না, রামনামের ভক্ত ছিলেন। রামের আদর্শ থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেননি। শুধু রামের নাম নিয়ে রাজনীতির ব্যবসা করেছেন। গুজরাটি বৈশ্য প্রতিভার এক অপূর্ব নিদর্শন। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন কোন মাল কেনাবেচা করে। আর এই অদ্বিতীয় গুজরাটি ব্যবসায়ীটি কোন মাল ছাড়াই ফ্রি-তে পাওয়া রামের নাম নিয়েই এক বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবসায়িক প্রতিভা দেখে জাত ব্যবসায়ী ঘনশ্যাম দাস বিড়লার মত ব্যক্তিরাও তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর জন্য নিজের কোষাগার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর জন্য বিড়লাজীকে অবশ্য বঞ্চিত হতে হয়নি। তাঁর চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত ডিভিডেন্ড পেয়ে যাচ্ছে। আরও কত প্রজন্ম পাবে তা বলার ক্ষমতা আমার নেই।

সুতরাং, রামনামের এই ব্যবসায় গান্ধী হলেন মহাত্মা, নেহরু হলেন রাজা, বিড়লা হলেন কুবের।

কিন্তু দেশ হল ভাগ, সমাজ হল ছিন্ন-ভিন্ন, ধর্ম হল অপমানিত, মানুষ হল রিফিউজি। গান্ধী রামের শুধু নাম না নিয়ে যদি রামের মত কাজ করতেন এবং রামের পথ অনুসারে চলতেন তাহলে আমাদের এই দুর্দশা হত না।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই রামের পথ ও গান্ধীর পথ সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। রামের নাম নিয়ে গান্ধী সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিলেন। শুধু ধোঁকা দিয়েছেন তাই নয়, তিনি রামের নাম দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিপথগামীও করেছেন, যার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। গান্ধীর পথকে বড়জোর শ্রীচৈতন্যদেবের পথ বা বুদ্ধদেবের পথ বলা যেতে পারে। কিন্তু তা কখনই রামের পথ নয়। রামের পথ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তা ছিল শক্তির পথ, শক্তি প্রয়োগের পথ। সুদূর আমেরিকার ব্যাঙ্কের ওই সিকিউরিটি গার্ড বলশালিনী মহিলাটি রামের ওই পথের অনুসারী। গান্ধীবাবা কখনই এই শক্তিপথের অনুসারী ছিলেন না। তাঁর পথ ছিল পিটিশন, আবেদন-নিবেদন, গোলটেবিল বৈঠক, অহিংস সত্যাগ্রহ ও অনশনের পথ। রাম কিন্তু সারাজীবনে একবারও অনশন করেননি। শত্রুর সামনে তো নয়ই, এমনকি মিত্রর সামনেও নয়। অনেকেই জানেন না—রাম যখন সোনার হরিণ মারতে গিয়েছিলেন, তারপর মায়াবী মারীচ যখন রামের তীর খেয়ে তার আসল রাক্ষস রূপ প্রকট করে নিহত হল, এবং মরার আগে রামের গলা নকল করে 'লক্ষ্মণ বাঁচাও' বলে মরে গেল, তখন রাম দ্রুত তাঁর কুটিরের দিকে ফেরার সময়ও আরেকটি হরিণ শিকার করে নিয়ে এলেন খাওয়ার জন্য। এই ঘটনা মূল সংস্কৃতে বাল্মীকি রামায়ণে আছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে রামের পথ আলাদা, গান্ধীর পথ আলাদা। গান্ধী রামভক্ত ছিলেন না। হয়তো রামনাম ভক্ত হলেও হতে পারেন।

রামের পথ ছিল শক্তিপথ। সেই পথের যোগ্য অনুগামী ছিলেন লক্ষ্মণ, জটায়ু, হনুমান, অঙ্গদ প্রভৃতিরা। সেই পথ তৎকালীন ভারতকে সন্ত্রাসমুক্ত করেছিল। আর গান্ধীর আপস-মীমাংসার পথ বর্তমান ভারতকে সন্ত্রাসযুক্ত করেছে। বর্তমানে সারাবিশ্বের পরিস্থিতির দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রভাবশালী দেশই ওই শক্তিপথটি অনুসরণ করে। আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, কোনো দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। আর সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি যেসব দেশ উন্নত অথচ নিজেরা শক্তিশালী নয়, তারাও কোন না কোন শক্তিশালী দেশের ছত্রছায়ায় আছে। আজকের পৃথিবীতে নিজ দেশের উন্নতি করে টিকে থাকতে হলে হয় নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে অথবা কোন শক্তিশালী দেশের ছত্রছায়ায় থাকতে হবে, যাকে বলে জোট। ভারত এই দুয়ের মাঝখানে থেকে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলছে। এটাও গান্ধীবাবার এক শিষ্যের অবদান। সেই শিষ্য ছিলেন চূড়ান্ত ভণ্ড ও কল্পনাবিলাসী। নাম তাঁর নেহরু। এঁর ভণ্ডামির কথা লিখতে হলে ১০০০ পাতার বই লিখতে হবে। পৃথিবীতে খারাপ লোক অনেক এসেছে। কিন্তু ভণ্ডামিতে ইনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যোগ্য। এঁর নাম থেকেই ভণ্ডামির শুরু। নাম লিখতেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। লোকে ভাবত ইনি বুঝি এক বড় পণ্ডিত। লোকের এই ভাবনাটাকে ইনি প্রশ্রয় দিয়ে বেশ উপভোগ করতেন। অথচ এদেশে যাঁদেরকে পণ্ডিত উপাধি দেওয়া হয় তাঁরা অবশ্যই সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শনে প্রকাণ্ড বিদ্বান। নেহরু সংস্কৃত ভাষা তো জানতেনই না, এমনকি সংস্কৃতের প্রতি তাঁর ছিল এক অবিমিশ্র তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা। ভারতের যা কিছু প্রাচীন সেই সবকিছুর প্রতি নেহরুর ছিল তাচ্ছিল্যভাব। আর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল দামী সিগারেট, মদের বোতল, শ্যাম্পেনের গ্লাস, সাদা চামড়ার মহিলা, বলড্যান্স ও ইংরাজি ভাষার প্রতি। তাহলে তঁকে পণ্ডিত বলা হত কেন? কারণ তিনি ছিলেন কাশ্মীরী পণ্ডিত বংশের লোক। সেই হিসেবে পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের হিসাবে নয়। অর্থাৎ নেহরু চাচা তাঁর নাম দিয়েই দেশকে ধোঁকা দেওয়া শুরু করেছিলেন। তার ধোঁকা জনগণের কাছে এমনই প্রবাদে পরিণত হয়েছিল যে তাঁর মৃত্যুর পরে জনগণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছিল এই বলে যে, নেহরুজী বিশ্বকে দিয়ে গিয়েছেন গ্যাস, ভারতকে অ্যাশ আর ইন্দিরাকে ক্যাশ। এর থেকে যোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য আর কী হতে পারে!

ভারতের দুর্ভাগ্য আর গান্ধীর দুর্বলতায় এই ভণ্ড ও কল্পনাবিলাসী নেহরু হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের

প্রথম প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেহরুর এই ভণ্ডামি ও কল্পনাবিলাসের পরিণামে ভারতের আজ এই দুর্দশা। তিনি জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! খেলেন চীনের গুঁতুনি। দেশ হল পরাজিত, অপমানিত, আর উনি হলেন শারীরিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাঁর ওই কল্পনাবিলাসের জন্য ভারত নিজেও শক্তিশালী হল না, কোন জোটেও গেল না। ব্রিটিশ আমলের ডিফেন্স ফ্যাক্টরিগুলোতে নেহরু হ্যারিকেন আর বাসন-কোসন তৈরী করাতে লেগেছিলেন। চীনের চাবুকে সম্বিত ফিরেছিল, যে চীনের সঙ্গে তিনি 'হিন্দী-চীনী ভাই ভাই' এর ধাষ্টামো করছিলেন। নেহরুর সেই গ্যাসীয় বিদেশ নীতির পরিণামে ভারতের প্রায় সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্র শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এইরকম দুর্দশা পৃথিবীর আর কোন বৃহৎ শক্তিধর দেশের হয়নি। গান্ধীর কাপুরুষনীতি ও নেহরুর কল্পনাবিলাসের ফলে আজ আমাদের এই অবস্থা। ১৯৪৭ সাল থেকেই ভারতের শক্তিপথ অনুসরণ করা উচিত ছিল। জাতীয় আয়ের এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ২০ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করা উচিত ছিল। যখন কোন বড় কলকারখানা তৈরি হয়, তখন প্রথমেই তার চারদিকে শক্ত বাউন্ডারি ওয়াল তৈরি করতে হয়। তার পর মেশিন বসানো হয় ও উৎপাদন শুরু হয়। সম্পদ বৃদ্ধির আগে সম্পদকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। সেদিন এই কাজ করা হলে আজ আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা খাতে এত বিপুল ব্যয়ও করতে হত না, কাশ্মীরে এত মূল্য দিতে হত না, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এতগুলি খ্রিস্টান রাজ্য ও উগ্রপন্থা তৈরি হত না, এবং সর্বোপরি সারা ভারতে কয়েক হাজার মিনি পাকিস্তান তৈরি হত না যেখানে পুলিশ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, আবগারি ও আয়কর বিভাগের সরকারি কর্মচারীরাও ঢুকতে ভয় পায়। সেখানে এদেশের সরকারের আইন চলে না, ইসলামের আদেশ চলে।

এ সবই হল শ্রীরামের পথ শক্তিপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পরিণাম। ভারতকে আবার সেই পথে ফিরিয়ে আনতে হবে। ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতার পথ ত্যাগ করতে হবে। তার জন্য ভারতের মানসজগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে হবে। সেই পরিবর্তন হবে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও গীতার উপর ভিত্তি করে। গীতগোবিন্দের উপর ভিত্তি করে নয়।